চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

এম. ফিল (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক: উমা বেরা

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 110995 of 2010-2011

ক্রমিক সংখ্যা: MPCO194008

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক: ড. সুমিতকুমার বড়ুয়া

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

২০১৯

Department of Comparative Literature

JADAVPUR UNIVERSITY

Kolkata 700 032

Certified that the thesis entitled, 'চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is being carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar held on 17th December 2018 at the Department of Comparative Literature, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

L.T.I of Uma Bera
16.05.2019

UMA BERA

Class Roll No. 001700203008

Registration No. 110995 of 2010- 2011

M. Phil Examination Roll No. MPCO194008

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Uma Bera entitled 'চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University.

Associate Profes
Bengali Departm
Jadavpur Univer
Kolkata-700 03

Parthasarathi Bhaumik — Sumit Kumar Barua 16/05/2019

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC

Department of Comparative Literature

Head
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

Assistant Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

JADAVPUR UNIVERSITY

KOLKATA- 700032

Department of Comparative Literature

This is to certify that the following pages contain original research on **"চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** by Uma Bera to be submitted in order to fulfill the partial requirement for the degree of master of philosophy in Comparative Literature at Jadavpur University, Kolkata. The research has been done under my supervision and I recommend it for examination. I further certify neither this page nor a part of it has been submitted in any other university for any diploma or degree.

Head
Department of Comparative Literature

Head
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

Supervisor
Department of Comparative Literature

16/05/2019

Assistant Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

মুখবন্ধ

সাহিত্য বিভাগে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে সকল শিক্ষার্থীর মত আমিও মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ করেছি। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে কয়েকশো বছর আগেকার সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, ঐ সময়কার সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি কেমন ছিল জানতে পেরেছি। যাঁরা এই তথ্যগুলির সমাবেশ করে কল্পনা ও সত্য ঘটনার দ্বারা সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সেই রচনার মধ্যে মৌলিক ভাব বজায় রেখেছেন তাদের মনঃস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়ও পেয়েছি।

মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে ঐ সময় থেকে আমি অল্প মাত্রায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ লাভের সময় আমার বিশেষপত্র ছিল মধ্যযুগের সাহিত্য। ঐ সময়ে আমি একটু বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠ লাভ করেছি। সেই সময় থেকে আমার বৈষ্ণবদর্শন সম্পর্কে জানার আগ্রহ জাগে। ইচ্ছা ছিল যদি কোনও দিন গবেষণা করার সুযোগ পাই, তাহলে জানার চেষ্টা করব কীভাবে বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই সঙ্গে ষোড়শ শতকে সমাজবাস্তবতা, রাজনীতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি, ভক্তিবাদ কীভাবে ফুটে উঠেছে। এই তথ্যগুলি খুঁজতে গিয়ে বহু পণ্ডিত, গবেষকদের বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়ে আলোচনা আমাকে সহায়তা করেছে।

আমার গবেষণার বিষয় — '*চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'। এই বিষয় নির্বাচনে আমাকে সহায়তা করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া।

আমার গবেষণা করার ইচ্ছা ছিল মধ্যযুগের নির্দিষ্ট সময়ে রচিত যে কোনো দুটি গ্রন্থের বৈষ্ণব প্রভাব নিয়ে। তাই আমি চৈতন্যচরিত গ্রন্থ *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* নিয়েছি। আমার তত্ত্বাবধায়ক কাজটি আমাকে নিজের মত করতে উৎসাহিত করেছেন এবং এই বিষয়ে

কাজ হয়েছে এমন বহু গবেষণালব্ধ বইয়ের (সেকেন্ডারি টেক্স্ট) নাম বলে আমাকে সহায়তা করেছে। পূর্ববর্তী গবেষক-পণ্ডিতদের ভাবধারা আমাকে এই কাজটি করতে সহায়তা করেছে। না হলে কাজটিতে যতটুকু আমি আমার ভাবধারা আলোকপাত করেছি, তা হয়ত সম্ভব হত না। তাই প্রথমে আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়াকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ্বর সিন্‌হা, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক স্যমন্তক দাস মহাশয়কে। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি অডিও মাধ্যমে পড়াশোনা করি। তাই আমাকে কাজের সুবিধার্থে মূল গ্রন্থ এবং সহায়ককারী সমস্ত গ্রন্থ রেকর্ডিং করে নিতে হয়েছে। আমার এই রেকর্ডিংয়ের কাজে সহায়তা করেছেন সোসাইটি ফর দ্য ভিজ্যুয়ালি হ্যান্ডিক্রাফট (SVH) লাইব্রেরির দিদিরা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সদ্য গড়ে ওঠা রেকর্ডিং সেন্টারের দিদিরা। এছাড়া বেশিরভাগ সহায়ক গ্রন্থ রেকর্ডিং করে সহায়তা করেছেন আমার রিডার এবং রাইটার দিদি সায়ন্তনী খাটুয়া। তাই তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া আমার কাছের বন্ধুরা বিশেষ সময় আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। তাই সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই কাজের ক্ষেত্রে আমি যতগুলি বইয়ের সহায়তা নিয়েছি, সেগুলি সমস্তই গ্রন্থাগার থেকে নিয়েছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার — এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে বইগুলি খুঁজে নিতে গ্রন্থাগারের আধিকারিকরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। তাই তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে গবেষণাপত্রটি আমাকে কম্পিউটার টাইপ করে সহায়তা করেছেন আমার কাছের বন্ধুরা। তাই সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূচীপত্র

ভূমিকা .... ১ – ১৭

প্রথম অধ্যায় — চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সমাজবাস্তবতা ও 'ভক্তি'নির্মাণ ১৮ – ৬১

ভূমিকা
পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মীয় পটভূমি
বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেবের অবদান
সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের ভূমিকা
শিশু নিমাইয়ের শৈশবলীলা ও শিক্ষা
নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ বর্ণনা
চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কর্তব্যবোধ
বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যবন হরিদাসের ভূমিকা
গৃহী বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের বৈষ্ণবধর্মে অবস্থান
চৈতন্য পূর্ববর্তী ভক্তিবাদের পটভূমি
চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি
উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায় — গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনেরর প্রস্থানভূমি রচনায়
চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত*এর অবদান- ... ৬২ – ১১৬

ভূমিকা
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রস্থানভূমি
সার্বভৌমের মানসিক ভাবধারার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের ভূমিকা
চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির স্বরূপ
বৈষ্ণব রসপ্রস্থানের নির্মাণকৌশল
বৈষ্ণদর্শনে পঞ্চরসের অভিনবত্ব
মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব
গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী
রাধাতত্ত্বকৃষ্ণতত্ত্ব-
চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রচারে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়
সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের উদারধর্মনীতির অবদান
উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায় — গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের
বিভাজন এবং উজ্জ্বলরসের অবস্থান ... ... ১১৭ – ১৪২

ভূমিকা
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের বিভাজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
বৈষ্ণবধর্মের জনসংযোগে চৈতন্যদেবের প্রভাব
চৈতন্য আদর্শের প্রতিগ্রহণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও সহজিয়া বৈষ্ণবদর্শন :
বৈষ্ণবধর্মের জনসংযোগে চৈতন্য পরিকরগণের ভূমিকা
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম সাধনায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের ভূমিকা
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সাধনপথ
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কারণ
সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধররেম্র সমন্বয়বাদী মনোভাব
উপসংহার

উপসংহার .... ১৪৩ – ১৪৭

গ্রন্থপঞ্জি .... ১৪৮ - ১৪৯

ভূমিকা

চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। তুর্কি আক্রমণের প্রায় তিনশো বছর পরে এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে নতুন যুগ ও নতুন রসের ব্যাখ্যা সূচিত হয়েছিল। তাঁর এই কর্মপন্থা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার জন্ম দেয়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মধারা থেকেই 'চরিত সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয় যার মূল কেন্দ্রে থাকে বৈষ্ণবদর্শন, ভক্তিরস, সমাজবাস্তবতা ও ইতিহাস।

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত*, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*, লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* চরিতগ্রন্থের পাশেই নাটক *চৈতন্যচন্দ্রোদয়*, এছাড়া মুরারীগুপ্তের করচা — চৈতন্যমাহাত্ম্যের পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্মের জনসংযোগের প্রয়াস কীভাবে সহজে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ব্যাখ্যা এই গ্রন্থগুলিতে উঠে এসেছে।

চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রেমমার্গী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় আর ধর্মাদর্শের ছবি ধরা পড়েছে। এই দুই মহাগ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মদর্শনের রূপটিকে আমরা বুঝতে চাই।

চৈতন্যদেবের দেহাবসানের পর বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম নামে বিভক্ত হয়ে যায়। বৈষ্ণবধর্মের এই বিভাজনের কীসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? এই গ্রন্থদুটিতে কি এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রস্থানের কোনও ইঙ্গিত আছে?

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই অর্থাৎ গুপ্ত রাজবংশের সময়কাল (চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ) থেকে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ছিল, যদিও সেই বৈষ্ণবধর্ম ছিল পৌরাণিক। তবে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের আমল (একাদশ-দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) থেকে যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ঘটেছিল তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল *ভাগবত* গ্রন্থ ও দর্শন। তুর্কি আক্রমণের (১৩০২-০৩ খ্রি.) পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় ও কুলীন সম্প্রদায় বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। অন্যদিকে নিম্ন উপজাতির মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও ওই সময় থেকে তন্ত্রসাধকদের কাছে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁর প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবধর্মের যে সংস্কারসাধন হয়েছিল সেখানে অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আড়ম্বরের পরিবর্তে শুদ্ধ নির্মল সহজ আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের 'চণ্ডালপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ'[১] অর্থাৎ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই হরিরনাম করার অধিকার আছে। এই একটি সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক স্তরে গণতান্ত্রিকতার সূচনা করেছিল। তখন থেকে বাংলায় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও গতিশীলতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। মুসলমান শাসকের ভয়ে নিজ কর্মপন্থা আর ধর্ম থেকে না সরে হিন্দুরা বিশেষত বৈষ্ণবেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিল।

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* একসঙ্গে পাঠ করলে পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের বিস্তৃত জীবনকাহিনি ও কর্মকাণ্ড। একই সঙ্গে এই গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন সময়ের ইতিহাস উঠে এসেছে। বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের পটভূমি কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই গ্রন্থগুলিতে রয়েছে। *চৈতন্যভাগবত*-এ নবদ্বীপ-শান্তিপুর তথা নদীয়ার

সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম চব্বিশ বছরের অর্থাৎ সাংসারিক জীবনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ পরবর্তী চব্বিশ বছরের জীবনকাহিনি বৃন্দাবনদাস সূত্রাকারে অন্ত্যখণ্ডে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরের জীবনকাহিনি সূত্রাকারে আদিখণ্ডে বর্ণিত আছে। তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ পরবর্তী শেষ চব্বিশ বছরের নীলাচল লীলার কাহিনি এবং ছয় বছর ব্যাপী ভারতভ্রমণের কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা থেকেই আমরা চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ পরবর্তী জীবনের ছবি এবং তৎকালীন সামাজিক জীবনের ইতিহাস পাই।

বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের বিস্তৃত পটভূমি চৈতন্যদেব তৈরি করে দিয়েছিলেন বৃন্দাবন, নীলাচল এবং বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছেন শ্রীবাস আচার্য, অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণব উপাসকদের। এঁরা সকলেই ছিলেন চৈতন্যদেবের ভক্তপরিকর। বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে। পূর্বাশ্রমে এঁদের নাম ছিল শাকর মল্লিক এবং দবীর খাস। পরে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট, গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামী। চৈতন্যদেবের এই ভক্তিমণ্ডলী পরে ষড়গোস্বামী নামেও অভিহিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশে ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক কৃষ্ণগ্রন্থ রচনা এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অন্য চারজন গোস্বামী এইভাবেই বৈষ্ণবের সেবা, বিষ্ণুভক্তি এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজেই নিজেদেরকে নানাভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর চরিতগ্রন্থ রচনা হয়েছিল। এই রচনার পেছনে নিত্যানন্দের প্রেরণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ আদেশে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন। মুরারী গুপ্তের 'করচা' নিত্যানন্দ ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ

নবদ্বীপলীলার সাক্ষী ভক্ত পরিকরদের বলা কাহিনি থেকেই তৎকালিন পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ করে কঠোর প্রতিবাদের সুরকে স্পষ্ট করেই তিনি *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর যেমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তেমনই প্রেমভক্তির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুর সাধনার ধারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। চৈতন্যদেব নগরকীর্তন প্রচার করেছিলেন এবং বৈষ্ণববিরোধী শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনসংযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন এমন দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে রয়েছে।[২]

বৃন্দাবনদাস ছিলেন চরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র। নিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ অনুচর ছিলেন বৃন্দাবনদাস। *চৈতন্যভাগবত*-এ গ্রন্থকার নিজেকে 'নিত্যানন্দের দাস' বলে অভিহিত করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস সহজ সরল ভাষায় প্রগাঢ় ভক্তিপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতদের পাশাপাশি বাংলার সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বৃন্দাবনদাস গ্রন্থে নিজের তেমন কোনও পরিচয় না দিলেও মধ্যলীলার বিংশ অধ্যায়ে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসূতা রূপে মা নারায়ণীর পরিচয় দিয়েছেন। বৈরাগ্যের কারণে বা লৌকিক পরিচয় রেখে যেতে না চাওয়ার কারণেই হয়ত গ্রন্থকারের এই মনোভাব ধরা পড়েছে।

চৈতন্যভাগবত, মধ্যলীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীবাস গৃহে নারায়ণী গয়া ফেরত চৈতন্যদেবের তাম্বুলির অবশেষ অংশ পেয়েছিলেন। চারবছরের নারায়নী তাম্বুলির অবশেষ অংশ গ্রহণের পর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়েছিল ।

চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিকো সম্বিত।[৩]

এইভাবে বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ মা নারায়ণীর কথা আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলায় বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল নিয়ে বৈষ্ণব

সাহিত্যিকদের ও গবেষকদের মধ্যে নানান মতভেদ আছে। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে বৃন্দাবনদাসের জন্ম ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ বা ১৪৪০ শকাব্দ।[৪] *চৈতন্যভাগবত* পাঠ করলে দেখা যায় বৃন্দাবনদাস দেখিয়েছেন গৌরাঙ্গের গয়া থেকে ফিরে আসার পর চার বছরের নারায়ণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। গৌরাঙ্গের গয়াভ্রমণের সময়কাল ১৪৩০ শকাব্দ (১৫০৮ খ্রি.),[৫] ১৫০৮-১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণীর বয়স যদি চার বছর হয়, তাহলে নারায়ণীর চোদ্দ বছর বয়সে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হলে বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল হয় ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ। বৃন্দাবনদাসের জন্ম হালিশহরে হলেও তাঁর শৈশবজীবন কাটে মামগাছিতে। বর্তমান নবদ্বীপ স্টেশন থেকে দুই মাইল ও নবদ্বীপের মালঞ্চ পাড়া থেকে তিন মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে মামগাছি গাঁ অবস্থিত। সেখানে বর্তমানেও নারায়ণীর সেবাপাঠ আছে।[৬] জনপ্রবাদ আছে এই সেবাপাঠ বাসুদেব দত্তের স্থাপিত। মামগাছি গাঁ থেকে বড়োগাছি গাঁয়ের দূরত্ব ছিল মাত্র তিন মাইল। এই বড়োগাছি গাঁয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যাতায়াত ছিল।

> বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
> নিত্যানন্দ স্বরূপে বিহারের স্থান।
> বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
> তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়।।[৭]

মামগাছি থেকে বড়োগাছির দূরত্ব কম থাকায় শৈশবেই নিত্যানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের সাক্ষাৎ ঘটা সম্ভব। বৃন্দাবনদাস বাল্যকাল থেকে বিদ্যাশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তাই তিনি অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের কাছে *শ্রীমদ্‌ভাগবত* পাঠ করেছেন এমন আভাস দিয়েছেন। বালক নিমাইয়ের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবত পাঠের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বৃন্দাবনদাস বার বার কৃষ্ণের বাল্যলীলা অর্থাৎ শিশু কানাইয়ের গোকুললীলা বর্ণনা করেছেন। প্রতিবেশীদের দুধ-ক্ষীর-মাখন চুরি, শিশু কানাইয়ের যমুনার জলের সখাদের সঙ্গে জলকেলির মত নবদ্বীপে শিশু নিমায়ের গঙ্গায় জলকেলির বর্ণনা করেছেন। এইভাবে *ভাগবত*-এ বর্ণিত কৃষ্ণলীলা *চৈতন্যভাগবত*-এ ফুটে উঠেছে।

বৃন্দাবনদাস শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত ছিলেন। নিত্যানন্দের সান্নিধ্য ও *ভাগবত* পাঠ শিক্ষা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। নিত্যানন্দের নির্দেশে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বাংলায় প্রথম চৈতন্যচরিত *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন। যৌবন বয়সে লিখিত হওয়ার কারণে মধ্যে বয়সোচিত প্রতিবাদী সত্তার ভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। *চৈতন্যভাগবত* রচনার স্থানে স্থানে অসহিষ্ণুতা ও যুবাচিত তেজ যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত তিনি আঠাশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি প্রথম মধ্যযুগে বাংলার সাহিত্য রচনার রীতি ভেঙেছিলেন। তৎকালীন সময়ে চণ্ডী, মনসা, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতাদের মাহাত্ম্যকথা নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল। এই প্রথার বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি মানুষের জীবনকাহিনিকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। যদিও চৈতন্যদেব বৃন্দাবনদাস এবং বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর কাছে কৃষ্ণের অবতার রূপে স্বীকৃত ছিলেন, তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস এবং বহু মানুষের জীবনযাত্রার ছবি নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইসব বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে *চৈতন্যভাগবত* সেই সময় বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

চৈতন্যভাগবত রচনার কাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। জগৎবন্ধু ভদ্র ও অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে *চৈতন্যভাগবত* ১৪৫৭ শকাব্দ বা ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[৮] সুকুমার সেনের মতে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পূর্বে এই গ্রন্থের পত্তন হয়েছিল এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের জন্মের পূর্বে এই গ্রন্থটির সমাপ্তি হয়েছিল।[৯] বৃন্দাবনদাস যখন চৈতন্যদেবের গয়া থেকে ফিরে আসার পর নারায়ণীর বয়স চার বছর বলেছেন এবং ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে যদি বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়, তাহলে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বৃন্দাবনদাসের বয়স হল তেরো থেকে পনেরো। এত কম বয়সে কী এত পাণ্ডিত্য এবং গভীরে সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দেওয়া সম্ভব! তাছাড়া চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পর্কে এত কিংবদন্তী দ্রুত ছড়ানো সম্ভব ছিল না। কিংবদন্তী যেমন তৈথিক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ এবং শিশু বিশ্বম্ভর বলছেন —

যাবত থাকয়ে মোর এ অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিমু সংহার।।[১০]

আবার দিগ্বিজয়ী পরাজয়ীর প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বলছেন –

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
যে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি।।[১১]

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বেশ কয়েকবছর পরেই এইসব কিংবদন্তী প্রচলিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া বৃন্দাবনদাস নিজেকে বলেছেন—

সর্বশেষ ভৃত্যতান বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র নারায়ণী গর্ভাজাত।।[১২]

এই গ্রন্থ রচনাকালীন যদি নিত্যানন্দ জীবিত থাকতেন তবে বৃন্দাবনদাস নিজেকে সর্বশেষ ভৃত্য বলতে সাহসী হতেন না। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, *চৈতন্যভাগবত*-এর রচনাকাল ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে।[১৩]

চৈতন্যভাগবত-এ যেমন অনেক কিংবদন্তী উঠে এসেছে, তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভেঙে যে কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তার স্পষ্ট আভাস বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন।

প্রথমত, আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদেগৌরাঙ্গনাগরবাদীগণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মধ্যখণ্ডের দশম এবং অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয়ত, মধ্যখণ্ডের ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বিংশ অধ্যায়ে গদাধর সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থত, মধ্যখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের দুই-তিন বছরের মধ্যে এতগুলি উপশাখা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না।

তাই অনুমান করা যায়, চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় দশ-পনের বছর পরেই *চৈতন্যভাগবত* রচনা হয়েছিল। তাই বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমিত *চৈতন্যভাগবত*-এর রচনাকালের সময়কাল বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

কবি বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত* রচনায় চৈতন্যদেবের জীবন ও কর্মকে যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মপদ্ধতির বর্ণনা করেছেন। যাঁরা নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তত্ত্বকে মানতেন না, তাঁদের প্রতি কবি সহিষ্ণুতা দেখাননি —

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে নাথি মারো তাঁর শিরের উপরে।।[১৪]

এই উক্তি তিনি বার বার করেছেন। কবি যদি মধ্য বয়সে বা শেষ বয়সে এই গ্রন্থটি রচনা করতেন, তাহলে অধিকতর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ পেত। তাছাড়া গুরু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতি অবিচল ভক্তিতে বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণবভক্ত এবং অবৈষ্ণবদের অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বৃন্দাবনদাস যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন তা নয়, সঙ্গীতবিদ্যার অধিকারীও ছিলেন। তাঁর রচনায় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়ের পাশাপাশি সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয়ের ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে। বৃন্দাবনদাসের কৃষ্ণভক্তি ও অনুরাগ *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায় চৈতন্যদেব শিশুকাল থেকেই দৈবমহিমা প্রচার করেছেন। বৃন্দাবনদাস দেখিয়েছেন শৈশবে শিশু নিমাই খুব কাঁদতেন তখন মা শচী বা অন্য কোনও পুরনারী কোনোভাবে সামলাতে পারতেন না, যতক্ষণ না হাতে তালি দিয়ে তারা কৃষ্ণনাম না করতেন। এইভাবেই শিশুকালে চৈতন্যদেব আড়াল থেকে নবদ্বীপকে কৃষ্ণনামে মাতিয়ে তুলেছিলেন। আদিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস বলেছেন একাধিকবার —

কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।[১৫]

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শন আছে। আবার কিছু ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। এইসব তথ্য শুধু ইতিহাসের ঘটনার বিষয় নয়, সমসাময়িক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের নিদর্শন রেখে গেছে। যেমন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সামাজিক কিছু দেশাচার ছিল যার গুরুত্ব অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দুরা মুসলমানের স্পর্শ করা অন্নগ্রহণ করতেন না। আর মুসলমানরা হিন্দুদের মুখ দেখলে অন্ন গ্রহণ করতেন না—

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।[১৬]

এমনই কঠোর দেশাচারে সমাজ পূর্ণ ছিল কবি সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবির বর্ণনায় উল্টো প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠেছে। তবে রামায়ণ গান শুনতে মুসলমানেরা আগ্রহী ছিলেন। রঘুনন্দের পিতা হারানোর কষ্টে যবনেরও চোখে জল আসত —

যবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভঁজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরনে।।[১৭]

যবনের এমন শ্রদ্ধাভক্তি হিন্দুর মহাকাব্যের প্রতি। বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত এই প্রতিচ্ছবি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে একটি নিদর্শনস্বরূপ। যবন হরিদাসের কঠোর প্রেমভক্তির দ্বারা হরিনাম সংকীর্তন মাহাত্ম্য, যবন হরিদাসের চৈতন্যের আলিঙ্গন লাভ এবং মহাপ্রভুর পরিকরদের মধ্যে স্থানলাভ — এই দৃষ্টান্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিশেষ নিদর্শন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবি বৃন্দাবনদাসকে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যচরিতের-এর ব্যাস বলে অভিহিত করেছেন। *চৈতন্যভাগবত* মধ্যযুগে সকল বৈষ্ণবভক্তের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং গুরুত্বলাভ করেছিল। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের সমকালে জন্মলাভ করলেও তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন করতে না পারার খেদ রয়েছে –

হইল পাণিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন ।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে।।[১৮]

বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর দর্শন লাভ না করলেও অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণব ভক্তদের থেকে নবদ্বীপ লীলার বর্ণনা শুনে শুনে একসূত্রে ঘটনা পরম্পরায় সাজিয়ে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছেন। তাঁর এই রচনায় মুরারীগুপ্তের করচার ভূমিকা বিশদভাবে আছে। বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপ লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলেও নীলাচল লীলা বর্ণনা অন্ত্যলীলায় সূত্রাকারে করেছেন। কারণ তিনি হয়ত চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলার কাহিনি বিশদভাবে সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনদাস জীবনের মধ্যবয়স থেকে শেষবয়স পর্যন্ত দেনুড়ে বসবাস করেছিলেন। তিনি এখানে বসে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন এমন প্রবাদ রয়েছে। এই গ্রামে বৃন্দাবনদাসের নামে শ্রীপাঠ রয়েছে। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই দেনুড়ে ১৫১১ শক অর্থাৎ ১৫৮৯ সালে দেহরক্ষা করেছিলেন।[১৯]

চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *চৈতন্যচরিতামৃত* বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার মধ্যে কবির বিচক্ষণতা ও ইতিহাস চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থটি শুধু তৎকালীন সময়ে নয় আধুনিক কালেও বেশ কিছুকাল ধরে ভারতীয় সাহিত্যে অদ্বিতীয় ও অপরিক্ষিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থের মধ্যে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি কোথাও নিজেকে 'কবিরাজ' বলেননি। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকে বৈষ্ণবভক্তেরা তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য বলে কি তাঁর উপাধি 'কবিরাজ' কিনা এই বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। তিনি গ্রন্থের মধ্যে নিজের জাতির কোনও পরিচয় দেননি, তিনি জাতিতে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণও হতে পারেন।

কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর সীমানায় ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরের অল্প দূরে ঝামটিপুর গ্রামে। আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি নিত্যানন্দের কথা বলতে গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। সেই পরিচয় থেকেই বোঝা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পূর্ণ গৃহস্থ ছিলেন এবং তাঁদের গৃহদেবতা পূজার জন্য পূজারী নিযুক্ত ছিল। বিষ্ণুর সেবার সঙ্গে সঙ্গে মহোৎসব ও কৃষ্ণের নামগান অর্থাৎ হরিকীর্তন হত। বৈষ্ণব এই কীর্তন আসরে বৈষ্ণব মোহান্ত

যেমন নিত্যানন্দের অনুচর রামদাসের আগমন হত।[২০] *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস বিবাহিত ছিলেন কিনা তার উল্লেখ নেই। তিনি ঘরসংসার ছাড়লেও সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হন নি। তিনি কবে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে না বলা গেলে নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনে এসে রূপ ও সনাতনের সঙ্গলাভ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস গ্রন্থে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীকে শিক্ষাগুরুরূপে বর্ণনা করেছেন। এই ষড়গোস্বামীরা হলেন — রূপ গোস্বামী (১৪৮৬-১৫৫৫), সনাতন গোস্বামী (১৪৮২-১৫৬৪), রঘুনাথ দাস (১৪৯৮-১৫৮৬), রঘুনাথ ভট্ট (১৫০৫-১৫৬৩), গোপাল ভট্ট (১৫০৩-১৫৭৫) ও জীব গোস্বামী (১৫১৭-১৬০২)।[২১] তবে তাঁর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত কবি *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে দেননি। শুধুমাত্র তিনি জানিয়েছেন তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন 'চৈতন্যের দাস'।[২২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মকাল নিয়ে নানান মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য কালক্রমকে ধরে নিতে পারি। কৃষ্ণদাসের জন্মকাল ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ।[২৩] তাঁর যদি জন্ম এইসময় হয়ে থাকে, তাহলে তিনি চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন কিন্তু *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এমন কোনও ইঙ্গিত দেননি যাতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে কৃষ্ণদাস যেহেতু বৃন্দাবনে গিয়ে বেশ কয়েকবছর সনাতনের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন তাই বলা যেতে পারে তিনি ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২৪] কৃষ্ণদাস *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বংশপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

> আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।[২৫]

এর থেকে বোঝা যায় তিনি গৃহকর্তা ছিলেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে অপমানের জন্য ভাইকে শাস্ত্রজ্ঞানের বুদ্ধি দিয়ে তর্কের মাধ্যমে পরাস্ত করেছিলেন। অন্তত ৩০ বছর বয়সে নিত্যনন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, ১৫৫৮

খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সনাতন গোস্বামীর মৃত্যুকাল ধরলে অন্তত দু-তিন বছর আগে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।[২৬]

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রন্থ রচনাকাল সম্পর্কে বলা যায় —

> শাকে সিন্ধুগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্যেঽহন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।[২৭]

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে গ্রন্থ রচনার সালটি একমতে ১৫৩৪ শক বা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ। অন্যমতে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ। কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থটি শেষ করেছেন জ্যৈষ্ঠমাসের রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে। এই দুটি সালেই কৃষ্ণপঞ্চমীর তিথি রবিবারেই পড়েছে। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দকে অধিকাংশ গবেষক গ্রহণযোগ্য মনে করলেও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে সংস্কৃত সাহিত্যের সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে সিন্ধু শব্দের অর্থ চার হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তাই তাঁর মতে ১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ হতে পারে।[২৮] সুকুমার সেনের মতে এই পুঁথিগুলির পেছনে যে সময়কাল উল্লিখিত তা হয়ত পুঁথি নকলের সময়কাল। তাঁর মতে এই পুঁথিগুলির আগে আরেকটি মূল পুঁথি ছিল। তাঁর মতে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর রচনা সময় ১৫৬৫-৮০ খ্রিস্টাব্দে।[২৯] ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দকে প্রায় সকল সমালোচক গ্রহণ করেছেন। কারণ কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ, জরাতুর ও নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন এমন উক্তি তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃদ্ধাবস্থার জন্য মধ্যলীলার মধ্যে অন্ত্যলীলার কিছু কাহিনি তিনি সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন।[৩০]

সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থরচনায় নিপুণভাবে কাব্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন করেছেন। তিনি গ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন যা চৈতন্যজীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য না হলেও তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্যজীবনীকে বিশ্লেষণ করেছেন, সেক্ষেত্রে তত্ত্বের গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে আদি ও মধ্যলীলায় তত্ত্বকথা বেশি রয়েছে। তিনি গ্রন্থের আদি ও মধ্যলীলা রচনায় মুরারীগুপ্তের করচা ও বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এর বর্ণনা গ্রহণ

করেছেন। তিনি বৃন্দাবনদাসকে গুরুরূপে স্বীকার করে চৈতন্যদেবের সংসার জীবনের প্রথম চব্বিস বছরের কাহিনি আদিলীলায় সূত্রাকারে বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকেই পরবর্তী চব্বিশ বছরের জীবনকাহিনি কৃষ্ণদাস মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলায় বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় তিনি স্বরূপ দামোদরের করচা, রঘুনাথদাসের কবিতা ও তাঁর থেকে শোনা বক্তব্যের সহায়তায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রীতিমতো বিচক্ষণতার সঙ্গে গবেষণার মাধ্যমেই ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেছেন।[৩১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে। দার্শনিক চিন্তার গভীরতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তার নিবিড়তায় পরিপূর্ণ এমন গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আজও রচিত হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই রচনায় ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেবের জীবন-আচরণের একটি নতুন দিককে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। তবে *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্য আলোচনার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের যুগে ব্যক্তিগত ভাব বিশ্লেষণ করার সুযোগ ছিল না। দেব-দেবীর কাহিনি বা কোনও মহাপুরুষের কাহিনিকে নিয়ে কবিকে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে হত। তবে এই গ্রন্থে নতুন ভাবের মাধুর্য প্রকাশের গুণে অনন্যতা পেয়েছে।

চৈতন্য মতের প্রধান দুটি গ্রন্থ *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত*। জীবনচরিত হিসেবে এই দুটি গ্রন্থ একে অপরের পরিপূরক হলেও কিন্তু তত্ত্ব হিসেবে গ্রন্থদুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে সহজে ধরা না পড়লেও তত্ত্ব বিশ্লেষক বৈষ্ণব পাঠকের দৃষ্টিতে সেই পার্থক্য ধরা পড়ে। *চৈতন্যভাগবত*-এ চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার। তিনি কলিযুগে নামসংকীর্তন প্রকাশ এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের নরলীলা মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনদাস মধ্যলীলার ঊনবিংশ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন দিগ্বীজয়ী পরাভূত জ্ঞানী

পণ্ডিত চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে চড় মেরেছেন। কারণ জ্ঞানমার্গী অদ্বৈত ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে বড় বলেছিলেন।[৩২] অন্যদিকে চৈতন্যদেব প্রচারিত নব বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা ছিল জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। ভক্তি এবং বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ সহজে তার লক্ষ্যপথে পৌঁছতে পারে এবং কর্মপথ সহজে ঠিক করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি অহংকারী, অন্যেকে হীন করে নিজেকে বড় করে দেখাবার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে কাজ করে। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত, ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণসেবার সার্থকতা, মানুষের সেবাকেই ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণদাসের ভাবনা ছিল আলাদা। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেব রাধাভাবে ভাবিত। তিনি 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর'। স্বরূপ দামোদর, রঘুনাথদাস, সনাতন ও রূপ গোস্বামীদের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অনুসারে চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি দ্বাপরযুগে গোকুলে লীলা করেছেন। প্রথমত, চৈতন্যদেব কলিতে ভাবাবেশে রাধাপ্রেমের উপলব্ধি করতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ কেমন ছিল? তৃতীয়ত, রাধাচিত্তে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য উপলব্ধি করা। দ্বাপরে কৃষ্ণ ও রাধা আলাদা আলাদা দেহে আবির্ভূত হলেও তারা ছিল একাত্মা। সেই অনুভূতি উপলব্ধি করতে কলিতে কৃষ্ণ ও রাধার একাত্মমূর্তিতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনে করেন। তাঁর মতে আসলে কৃষ্ণ ও রাধা অভেদ ও অভিন্ন।[৩৩]

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ তৎকালীন সমাজ ও হিন্দুধর্মের নানা দোষ-ত্রুটি আর দুর্বলতার কথা রয়েছে। বিদ্যা আর অর্থের অহংকারী ব্যক্তিরা এই দোষ-ত্রুটি আর দুর্বলতা রচনার কাজ চালিয়েছেন। চৈতন্যদেব তারই মূলে আঘাত হেনেছিলেন। তাঁর বৈষ্ণবধর্ম কীর্তনপ্রধান, আনুষ্ঠানিকতাবিহীন প্রাণের ধর্মরূপে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তাঁর নির্দেশে রূপ গোস্বামীর নেতৃত্বে, অন্য পাঁচজন গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের সক্রিয় সহযোগিতায় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গড়ে উঠেছিল যা নিজের বৈশিষ্ট্যেই বিশিষ্ট। রাধাপ্রাধান্য গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের সুদৃঢ় ঐতিহ্যময় পাণ্ডিত্যের অহংকারকে বর্জন করা হয়েছে, প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভক্তিকে।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ দুটির রচনাকালের মধ্যে ষাট বছরের ব্যবধান থাকলেও এই গ্রন্থ দুটির মূল বিষয় চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যেমন একশো পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, সমাজ বাস্তবতা, রাজনীতি, ধর্মীয়-সংস্কৃতি, দর্শন ও কৃষ্ণভক্তি-প্রেমের নানান দিকের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি বৈষ্ণবকবিরা এই রচনাগুলির মধ্যে মৌলিক ভাবধারা বজায় রেখে আধুনিকতার ছাপকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েই যুগের থেকে ভাবনাচিন্তায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাঁদের গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁদের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞার' প্রিচয় ধরা রয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেঙে সাধারণ মানুষ কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদের মাধ্যমে কীভাবে সমাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রথম অধ্যায়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার গুরুত্ব, পণপ্রথার বিরোধিতাসহ নানান কুসংস্কারের বিরোদ্ধাচারণ, শাসকশ্রেণি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল জাতের মানুষ এই লড়াইয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। মধ্যযুগে রচিত চরিত সাহিত্যধারার মধ্যে আধুনিক ভাবধারার প্রতিচ্ছবি কীভাবে ফুটে উঠেছিল তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব কবিগণ এই রচনাদ্বয়ের মধ্যে প্রথম কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কীভাবে চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চরসের উত্থান ঘটেছে এবং কৃষ্ণপ্রেমভক্তির জোয়ার বয়ে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লাভ করেছে – দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার অনুসন্ধান করব।

তৃতীয় অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণবধর্ম – গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে বিভক্ত হওয়ার কারণে কীভাবে সাধনপদ্ধতি আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং রসপ্রস্থান কীভাবে ঐ দুই সম্প্রদায়ে ভূমিকা লাভ করেছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম এবং চৈতন্যদেবের মহিমা এই সম্প্রদায়গুলিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে, কীভাবে মধ্যযুগে রচিত গ্রন্থদুটি আধুনিকতার পথিকৃৎ হয়ে রয়েছে – সেইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

আমাদের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালির ধর্ম-সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ধারণা তৈরি হতে পারে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র ::

১। গিরি, সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত) (২০১৩)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ২।

২। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত*। মধ্যলীলা, দশম অধ্যায়। নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ১৩৩

৩। *চৈতন্য ভাগবত*। মধ্যলীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৯৩।

৪। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ১৮৪।

৫। তদেব। পৃ. ১৮৪।

৬। তদেব। পৃ. ১৮৭।

৭। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *চৈতন্য ভাগবত*। অন্ত্যলীলা, পঞ্চম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৭২।

৮। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। তদেব। পৃ. ১৯০।

৯। তদেব। পৃ. ১৯০।

১০। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *চৈতন্য ভাগবত*। আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৯।

১১। *চৈতন্য ভাগবত*। আদিলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫৫ ।

১২। *চৈতন্য ভাগবত*। অন্ত্যলীলা, পঞ্চম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৭৩ ।

১৩। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। পৃ. ১৯৪।

১৪। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *চৈতন্য ভাগবত*। অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৭৭।

১৫। *চৈতন্য ভাগবত*। আদিলীলা, চতুর্থ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৬।

১৬। *চৈতন্য ভাগবত*। আদিলীলা, চতুর্দশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৬৬।

১৭। *চৈতন্য ভাগবত*। অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২৫১।

১৮। *চৈতন্য ভাগবত*। মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৮৫।

১৯। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। তদেব। পৃ. ১৯৪।

২০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (১৯৯৭)। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা: সোনার তরী। পৃ. ৭১-৯৯।

২১। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। আদিলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৮।

২২। *চৈতন্যচরিতামৃত*। তদেব। পৃ. ৮।

২৩। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (১৯৯৩)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। পৃ. ১৫৬ ।

২৪। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। তদেব। পৃ. ২৯৬ ।

২৫। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। আদিলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৮।

২৬। মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। তদেব। পৃ. ২৯৬।

২৭। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (১৯৯৩)। তদেব। পৃ. ১৫৬ ।

২৮। তদেব। পৃ. ১৫৬।

২৯। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। ভূমিকা। পৃ. ১৪ ।

৩০। *চৈতন্যচরিতামৃত*। মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৩৯।

৩১। *চৈতন্যচরিতামৃত*। মধ্যলীলা, সপ্তম-নবম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৬৫-৮২।

৩২। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্য ভাগবত*। মধ্যলীলা, ঊনবিংশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৬৯।

৩৩। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫-৬।

প্রথম অধ্যায়

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সমাজবাস্তবতা ও 'ভক্তি'নির্মাণ

ভূমিকা

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব উপাসকের প্রতিপত্তি বিষ্ণুর আরাধনার মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণু আরাধ্য দেবতা ছিলেন। তাই বৈষ্ণবধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সেইভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে ভক্তি বিস্তার লাভ করলেও তার প্রভাব সুগভীর ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম প্রেমভক্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। চৈতন্যদেব একজন সমাজসংস্কারক হিসাবে নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজের নানান স্তরে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ধর্মীয় আন্দোলন বহুমাত্রিকতা লাভ করেছিল।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাংলা সাহিত্যে 'চরিতসাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছিল। এই চরিতসাহিত্যগুলির মূলকেন্দ্রে অবস্থান করেছে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ও পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সমাজবাস্তবতা। চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপে প্রচারিত প্রেমভক্তির ইতিহাস কীভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁর উপর ষোড়শ শতকের সমাজবাস্তবতার প্রভাব কীভাবে পড়েছিল, তিনি কীভাবে সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারসাধনে ভূমিকা নিয়েছিলেন, কাশী, বৃন্দাবন, নীলাচলে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি প্রচারের ইতিহাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থদুটির নিরিখে ষোড়শ শতকের সামাজিক ইতিহাস এবং কৃষ্ণভক্তি নির্মাণের ইতিহাসের অনুসন্ধান করব।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের বাংলা বিজয় মধ্যযুগের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের

মধ্যভাগে মধ্য এশিয়া থেকে ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল ভুজ, খিলাজী, খালাজী প্রভৃতি মুসলিম উপজাতি। ইসলামধর্মে বিশ্বাসী বক্তিয়ার খলজির বাংলার নদীয়া আক্রমণের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। বর্ণভেদপূর্ণ বাঙালি সমাজ এবং সেনরাজ্য সেই সময় অন্তঃস্থল থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই মুসলিম শাসক দ্বারা নদীয়া আক্রমণ হলে গৌড় থেকে লক্ষণসেন (১১৭৮-১২০৬)[১] পালিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গে আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর কোনক্রমে সেনবংশের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মীয় পটভূমি

মুসলমান শাসনের প্রায় দু'শো বছর পরে সাময়িকভাবে হিন্দু রাজা গণেশের উত্থান (১৪০০-১৪৪১)[২] ঘটলেও দিল্লির সুলতানের আক্রমণে রাজা গণেশ নিজে থেকেই পরাজয় স্বীকার করেন। এর থেকে স্পষ্ট হয় হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণে অসন্তুষ্ট হলেও বীতশ্রদ্ধ নয়। রাজা গণেশের পুত্র যদু পিতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মান্তরিত হয়ে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন (১৪১৮)। এরপর থেকে প্রায় নব্বই বছর মুসলিম শাসকের অত্যাচার বাড়ে এবং ধর্মান্তরকরণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় উজীর হুসেন শাহ ও তাঁর রাজবংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) [৩] রাজ্যশাসন করেন। এই রাজবংশের শাসনকার্যের বেশির ভাগ উচ্চপদাধিকারী ছিল হিন্দুরা। তাঁর শাসনব্যবস্থায় জাতিভেদ ছিল উদার ধর্মনীতির পরিপন্থী। তাই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। হুসেন শাহ পরবর্তীকালে আরও প্রায় দুশো বছরের বেশি সময় ধরে মুসলমান শাসকের অধিকারে বাংলার শাসনক্ষমতা ছিল। এই সময় থেকে হিন্দুরা নিজধর্ম পালনে চরম বাধার সম্মুখীন হয়নি, কারণ প্রায় প্রত্যেক শাসকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিন্দুরাই নিযুক্ত হতেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বেশ কয়েকশো বছর আগে গুপ্তযুগ 'চতুর্থ-পঞ্চম' [৪] শতক থেকে বাংলা তথা ভারত ভূমিতে প্রচলন ছিল বর্ণাশ্রম প্রথা, যথা — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

ব্রাহ্মণরা ধর্ম আলোচনা করার যেমন অধিকারী ছিল তেমনি পণ্ডিত বা আচার্য হিসেবে শিক্ষাদান করার অধিকার ব্রাহ্মণদেরই ছিল। সেখানে শূদ্রদের কোনও শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না। এই মূল সংস্কার ভরা গণ্ডি থেকে যে এক-দুইজন পণ্ডিত বেরিয়ে আসতে পারতেন তাঁদের কাছে কোনো কোনো ইচ্ছুক শূদ্র ছাত্র শিক্ষালাভ করতে পারত। এমনই ধারা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বেশ কয়েকশো' বছর ধরে চলে আসছিল। গুপ্তযুগ, পালযুগ, সেনযুগ — এইভাবে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটেছে, একই সঙ্গে নতুন যুগের উত্থান ঘটেছে। ভারতীয় সাহিত্যে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চিন্তাধারার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

খ্রিস্টিয় একাদশ শতকের প্রতিষ্ঠিত সেনযুগের রাজারা ছিলেন *শ্রীমদ্‌ভাগবত*-এর বর্ণিত কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। সেনরাজা বল্লাল সেন কৌলীন্যপ্রথা প্রচলন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে বেশ কয়েকশো বছর ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রতিপত্তি ছিল এবং ঐ সময় থেকেই সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ছিল বিশেষভাবে। লক্ষণ সেনের সভাকবি উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন, জয়দেব প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিষ্ণুর উপাসক জয়দেব *গীতগোবিন্দ* নামে বৈষ্ণব গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যে ফুটে উঠেছে অবতার কৃষ্ণের প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থেই কৃষ্ণ নররূপে অবতীর্ণ নয়, তাঁর অন্তররূপের প্রকাশ পেয়েছে। সেনযুগ থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যপাঠের অধিকার ব্রাহ্মণদের ছিল তাই তৎকালীন সময় বৈষ্ণব উপাসকদের পুরোপুরি ব্রাহ্মণ সমাজের উপর নির্ভর করতে হতো। ব্রাহ্মণদের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বিষ্ণুর উপাসক হতে পারতেন। বিষ্ণুর উপাসনার সময় ব্রাহ্মণরাই *গীতা* ও *ভাগবত* পাঠ করতেন। পঞ্চদশ শতকে শ্রীহট্ট থেকে উঠে আসা ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস আচার্য, পরম ধার্মিক বৈষ্ণব জগন্নাথ মিশ্র প্রমুখ নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে আচারবিহীন প্রেমভক্তির দ্বারা বিষ্ণুর উপাসনা ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসেবা করতেন। তাঁদের মতে সকল জাতির মানুষই বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারাই বিষ্ণুসেবা করতে পারেন। তাঁদের

এই মহৎকর্মের উদ্দেশ্য পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের দ্বারা সমাজে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লাভ করেছিল।

খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের (১২০২ খ্রি.)[৫] পর হিন্দুশাসনের অবসান ঘটে এবং বর্ণাশ্রমপ্রথায় আঘাত আসে। কারণ বিধর্মীর হাত থেকে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস বাঁচাতে উচ্চবর্ণের সকল হিন্দুই প্রায় নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করেছিলেন। রাজারা নিজ নিজ রাজকোষ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিম্নশ্রেণির কিছু মানুষ অসহায় হয়েই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। আর কিছু মানুষ হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা রেখেই অপদেবতার উপাসনা করতেন, কেউ কেউ চণ্ডী, মনসা, বিষ্ণুর উপাসনাও করতেন। ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে নয়, তাঁদের উপাসনা ছিল ভক্তি, বিশ্বাস আর নামগান নির্ভর। এইভাবেই তাঁরা অনেকে মিলে এক-একটি পথ অনুসরণ করে শাসকশ্রেণির মুখোমুখি হয়ে বেঁচে থাকার শক্তি সংগ্রহ করেছেন। ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা ছাড়া ধর্মোপাসনা করার স্পর্ধা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণরা মেনে নিতে পারেন নি। ফলে ধর্মোপাসকদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণদের এক প্রকার দ্বন্দ্ব থেকে যায়। এইভাবে নিম্ন-উপজাতি হিন্দুসমাজ একদিকে শাসকশ্রেণির অত্যাচার, অন্যদিকে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অবজ্ঞা-অবহেলার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বাংলার নদীয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানের পাশাপাশি ভারতীয় ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে যেমন কাশী, নীলাচল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে এরকম জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগের সমাজে এইভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে বাস্তববোধ ও ভক্তি-বিশ্বাস জেগেছিল। এমন সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব — তাঁর ভক্তিসাধনা মধ্যযুগের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা।

মুসলমান শাসকের শাসনে যখন একদিকে হিন্দুজাতি জর্জরিত, তখনই অন্যদিকে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ধর্ম উপাসনার বিষয়ে প্রবল বিরোধিতা মধ্যযুগের সমাজে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এমন সময় এক ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ কালে নবদ্বীপে পরম ধার্মিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জন্ম নিয়েছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩

খ্রি.)।[৬] তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বাংলা চরিতগ্রন্থ। তিনি নির্যাতিত মানবজাতির মধ্যে 'নবজাগরণ' ঘটিয়েছিলেন। সেই নবজাগরণের হাওয়া বাংলা ও বাংলার বাইরে নির্যাতিত মানবজাতির মধ্যে বয়ে গিয়েছিল। অন্যায়-অত্যাচার মুখ বন্ধ করে সহ্য করা নয়, গণ আন্দোলনের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই হল মানবজাতির প্রধান ধর্ম। চৈতন্যদেব নবজাগৃতির এই ধারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা এবং বাংলার বাইরে তৎকালিন সময়ে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের মাধ্যমে এই প্রয়াসের কথা বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্যে বর্ণিত আছে।

বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের শাসনকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁর পরিচালিত ধর্মবিপ্লব সমাজ বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল যা আজও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনার নিদর্শনস্বরূপ হয়ে আছে। চৈতন্যদেব প্রচারিত রাগানুগা ভক্তি, প্রেম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে এমন কালজয়ী হয়ে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বৃহত্তর স্থান তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। শাসকবর্গের অপশাসন এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তিনি তাঁর ভক্তিপ্রেমের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সমাজে সমানভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পথ করে দেখিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, যুগ যুগ ধরে অপশাসিত, অবহেলিত, ভীত-সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠী প্রেম-ভক্তি ও নামগানের মধ্য দিয়েই সমাজের কাছে পৌঁছে যাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ি ও ছুৎমার্গের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবে সাধারণ মানুষ।

চৈতন্যদেব জানতেন ভক্তির বাধাবন্ধনহীন পথেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সম্ভব। আর সেই মানুষরাই হবে বিপুল এক সামগ্রিক শক্তি, সেই শক্তির উৎস হবে ভক্তি, প্রেম ধর্ম পরায়ণতা ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য। সুলতান, বাদশা, নবাবরা আর কোনও ভাবেই তাদের ধর্ম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না। চৈতন্যদেবের কর্ম ও ধর্মপথের শক্তির উৎস ছিল এই সাধারণ জনগণ। বৈষ্ণব ধর্ম ভারতের বহু জাতির সাধনার অঙ্গ ছিল অর্থাৎ

প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুর উপাসকরাই ছিলেন বৈষ্ণব। মধ্যযুগে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার বিস্তার লাভ করেছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে। চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টাতেই বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু সমাজ তথা ভারতীয় সমাজেই জনসংযোগ ঘটিয়েছিল।

চৈতন্যদেবের জীবন ও কর্ম নিয়েই তার জীবদ্দশাতেই সংস্কৃত সাহিত্যে কবিতা, নাটক রচিত হয়েছিল এবং বাংলায় পদগান রচনা শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) পর সেই রচনার ধারা নতুন এক মোড় নিয়েছিল জীবনীসাহিত্য সৃষ্টিতে। এই চরিতসাহিত্যের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত ছিল প্রায় পঁচাত্তর-আশি বছর। গতানুগতিক বিষয়বস্তু ও ভাবধারাকে অতিক্রম করে চৈতন্যজীবনী রচনার প্রয়াস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আগে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল পুরাণকথা। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী, দেবতার মাহাত্ম্য বিষয়ক মঙ্গল কাহিনি। পুরাণের দেবতারা ত্রেতা, দ্বাপর যুগ থেকেই ছিলেন কল্পজগতের অধিবাসী। লৌকিক জগতের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে অলৌকিকতার গণ্ডি অবলুপ্ত হতো না। মঙ্গলকাহিনির দেবতারা লৌকিক জগতে আবির্ভূত হতেন ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ভক্তি আদায় করতে। সেই ভক্তি ছিল ভয়ের নামান্তর। চৈতন্যচরিত কথাতেই প্রথম প্রত্যক্ষ হয়েছিল একটি মানুষের জীবনলীলা লৌকিক হয়েও যা অলৌকিক দেবলীলার সঙ্গে সমতুল্য। কারণ একদিকে চৈতন্যদেব যেমন তাঁর প্রিয় ভক্তমণ্ডলীর কাছে অবতাররূপে আখ্যায়িত হয়েছেন তেমনই অন্যদিকে তিনি কর্মকাণ্ড দর্শন ও প্রেম-ভক্তি দিয়ে জনসংযোগ ঘটিয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। তাই চৈতন্যদেব হয়েছিলেন মধ্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতির তথা বাংলা সাহিত্যের প্রেরণা।

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন সমকালীন বিদ্বান পণ্ডিতদের মতই লেখক, কবি, নৃত্য-গীত শিল্পীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পরিকরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন লেখক। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা নিয়ে পদরচনা

করেছেন। তাঁদের পদগুলিতে গৌরাঙ্গলীলা মুখ্য হয়ে উঠেছে কারণ, এঁরা সকলেই প্রায় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার সাক্ষী ছিলেন। যেমন — মুরারী গুপ্ত, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব সেন, শিবানন্দ সেন প্রমুখ। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় আশি বছর বয়সে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় মূলত নবদ্বীপ তথা বাংলাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় বাংলার সঙ্গে কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, নীলাচল, দক্ষিণ ভারত তথা সমগ্র ভারতবর্ষ সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের সাহচর্যে না এলেও নিত্যানন্দের প্রেরণাতেই চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখায় একদিকে যেমন উঠে এসেছে বৈষ্ণবোচিত বিনয় ভাব, তেমনই পরতে পরতে প্রতিবাদী সত্তার দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। নবদ্বীপের বর্ণনা করার সময় বৃন্দাবনদাসের অতিশয়োক্তি ফুটে উঠেছে। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস গুরু নিত্যানন্দ ও প্রভু চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধানত। এটি আসলে তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ভাবেরই প্রকাশ। এই গ্রন্থেই আবার অন্যায়ের প্রতিবাদ রয়েছে। নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন —

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একগঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহ দক্ষ।।
সবে মহা অধ্যাপক কবি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ্যকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।।[৭]

নবদ্বীপ প্রসঙ্গে অতিশয়োক্তি থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবনদাসের লেখা *চৈতন্যভাগবত*-এর তথ্যমূল্য অসাধারণ। কারণ, বাংলা তথা নবদ্বীপে সমাজব্যবস্থার বর্ণনা তিনি নিখুঁতভাবেই তুলে ধরেছেন। বৃন্দাবনদাস এই চরিত গ্রন্থে রাধাপ্রসঙ্গ একবার মাত্র তুলে ধরেছেন। মূলত চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা তথা সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থেই বৃন্দাবনদাস গুরু নিত্যানন্দের লীলাবর্ণনার সঙ্গে প্রায় কুড়ি বছরের ভ্রমণ দক্ষিণভারত তথা ভারত ভ্রমণের বর্ণনা নিখুঁতভাবে করেছেন। এর থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে গুরু নিত্যানন্দের প্রতি তাঁর ভক্তি কতটা প্রগাঢ় ছিল। এই গ্রন্থে নিপুণভাবে নিত্যানন্দের লীলাবর্ণনা করাই হল বৃন্দাবনদাসের অন্যতম কৃতিত্ব। চৈতন্যচরিত গ্রন্থে নিত্যানন্দের লীলাবর্ণনা করাও তাঁর অপর উদ্দেশ্য ছিল। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁর সম্প্রদায়ের অনেকেই নিত্যানন্দকে মানতে চাইতেন না। *চৈতন্যভাগবত*-এ বৃন্দাবনদাস এই শ্রেণির বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দিয়েছেন ।

ধীর, প্রাজ্ঞ, পরম ধার্মিক বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পরবর্তী শেষ চব্বিশ বছরের জীবন কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । অর্থাৎ এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলা মুখ্য ভূমিকা লাভ করেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনও মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিনা সেরকম স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত তিনি এই গ্রন্থে দেননি, তবে তিনি নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। তাঁর স্বপ্নাদেশেই যে তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি এই গ্রন্থে দিয়েছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেব প্রেরিত গোস্বামীবৃন্দের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে কৃষ্ণ সেবায় পুরোপুরি নিয়োজিত করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এই ষড়গোস্বামীকে 'শিক্ষাগুরু' রূপে স্বীকার করেছেন। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার অনেক তথ্য গোস্বামীদের কাছ থেকে কৃষ্ণদাস পেয়েছিলেন। গোস্বামীদের প্রেরণাতেই কৃষ্ণদাস আকর *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

মূলতত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, চৈতন্যতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যতত্ত্ব অনুযায়ী তিনি কেবল কৃষ্ণের অবতার নন, রাধা ও কৃষ্ণের যুগল রূপ। চৈতন্য অন্তঃকৃষ্ণ-বহিঃগৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত অর্থাৎ রাধাভাবে ভাবিত। *চৈতন্যভাগবত* রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। *চৈতন্যভাগবত*–এ এই তত্ত্বের কোনও উল্লেখ নেই। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থা যেসব ভাবলক্ষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত *চৈতন্যভাগবত*-এর মধ্যলীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৌরাঙ্গের আবেশ বর্ণনায় দেখা যায় —

যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কি কহিব তাহা সব জানে প্রভু শেষ।।
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী ধারে।।
কনক পনস যে পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহুরঙ্গ।।
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্ছিল প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক।
হাঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে।।
সর্বঅঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়।।[৮]

এই প্রসঙ্গে *চৈতন্যভাগবত*-এর অন্ত্যলীলার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল —

রোমহর্ষ অশ্রু কম্প হুঙ্কার গর্জন।
স্বেদ বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ।।
যত ভক্তি বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে।।
যত ভক্তি বিকার সবেই মূর্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর কলা মহাজ্ঞান বন্ত।।[৯]

এই সকল আবেশ রাধাভাবের লক্ষণ, তাই চৈতন্যদেবের আবেশ রাধাভাবের আবেশ বলেই স্বীকৃত হয়। এর থেকে এই সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে না বলা থাকলেও *চৈতন্যভাগবত*-এ রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ আভাসিত।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেবের অবদান

চৈতন্যদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার। অলৌকিকতা ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই বৈষ্ণবদের বিশ্বাসে অলৌকিকতাও রসসিদ্ধ বস্তু। তাছারা মধ্যযুগের সমাজে আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক বাস্তবতা আশা করা কঠিন। তাই অলৌকিকতার আড়ালে ঐতিহাসিক বাস্তবতা দাঁড়িয়েছে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বাসের বিশেষত্ব এই যে তা চৈতন্য অবতারের নরলীলা বিশিষ্ট। তিনি লৌকিক জীবন আচরণের মধ্যে দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যা তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর পরবর্তীকালের চরিতগ্রন্থগুলিতে ইতিহাস ও বাস্তবতা একেবারে বাদ পড়তে পারে নি। অলৌকিকতার আড়ালে ঐতিহাসিক চৈতন্যদেবের জীবনলীলার কাঠামোটি মোটামুটি অবিকৃতই রয়েছে।

অতিশয়োক্তি অলৌকিকতা কিংবদন্তী থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি গ্রন্থে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক উপাদান আছে। সেদিক থেকে প্রতিটি চরিতগ্রন্থ ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান। তবে সবচেয়ে মূল্যবান বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*। ভক্তির আতিশয্য এবং অলৌকিকতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাসের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি নিছক চৈতন্যদেবের জীবনলীলা বর্ণনা করেননি। নবদ্বীপকেন্দ্রিক বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসকে প্রতিকূল ও অনুকূল সামাজিক পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। সেই সঙ্গে ক্রমবিবর্তিত চৈতন্যের স্বরূপকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। *চৈতন্যভাগবত*-কে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আকরগ্রন্থ বললে ভুল বলা হয় না, কারণ অতিরঞ্জন

সত্ত্বেও নবদ্বীপের বর্ণনার বাস্তবতা চাপা পড়েনি। নানা বৃত্তির নানান জাতির কর্মচাঞ্চল্যে, বিদ্যাচর্চার গৌরবে, জনজীবনের কলরবে প্রাণবন্ত নবদ্বীপের যে ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে, তা অন্য কোথাও মেলে না।

চৈতন্যের আবির্ভাবের সমকালে ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থার যে পরিচয় বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন তা কেবল তথ্য সমাবেশে সমৃদ্ধ নয়, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হয়েছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। নবদ্বীপে পণ্ডিতে পণ্ডিতে শিক্ষার লড়াই, বিদ্বান ব্যক্তিরা পুত্র-কন্যার বিবাহে অযথা ধন নষ্ট করছেন। মদ্য-মাংস খেয়ে উন্মাদ হয়ে কেউবা দম্ভ করে চণ্ডীর পূজা করছেন। অন্যদিকে কতিপয় বৈষ্ণবের শান্তিতে বসবাসের স্থান জোটে না, তাঁদের দেখে পাষণ্ডরা হাসেন, শোষিতের প্রতি শাসকের অত্যাচার চলে। এমনই নবদ্বীপের টালমাটাল পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশ বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ বর্ণিত হয়েছে। সমকালীন বাংলার শাসনব্যবস্থা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার যে ছবি গ্রন্থে উঠে এসেছে তা ইতিহাসসম্মত। যে সময় গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ হিন্দুদেউল ভাঙলেও রচনা থেকে জানা যায় যে তিনি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চৈতন্যদেবকে ধর্মাচরণে স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছিলেন। শরিয়তী আইন অনুসারে কাজী ধর্মান্তরিত মুসলমান হরিদাসকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করেছিলেন, তবে সাধারণ মুসলমানরা যে এতে জড়িত ছিলেন না, তার প্রমাণ প্রচুর। বরং যবন হরিদাসের বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরণের জন্য মুলুকপ্রতি মুসলমান হয়েও বেদনা বোধ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নবদ্বীপের শাসনকর্তা কাজীর কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা বিধর্মীর বিদ্বেষ বলা চলে না, কারণ সংকীর্তন ছিল প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে অশাস্ত্রীয়। তাছাড়া শাসকদের চোখে সংকীর্তন ছিল কোলাহল, নাগরিকের শান্তি বিঘ্নকারী হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনার ক্ষেত্রে। কাজী প্রশাসনিক দায়িত্ববোধের কারণে সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। *চৈতন্যভাগবত*-এর বর্ণনা অনুযায়ী কাজীর ঘরদোর ভাঙ্গা, ফল ও ফুলের বাগান লণ্ডভণ্ড করা, প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক হুঙ্কার দেওয়া ইত্যাদি কাণ্ডের পর প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা

তুলে নিতে স্বীকার করেছিলো। তবে বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ এক গ্রাম্য কাজীর কথা তুলে ধরেছেন, যিনি কীর্তন বিদ্বেষী ছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের কৃতিত্ব ষোড়শ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে বাঙালি সমাজ, জীবন যাত্রার বিশেষত্ব, পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রচনায় উক্তির আতিশয্য ও লৌকিক প্রাপ্তি বাস্তব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে সর্বত্র আচ্ছন্ন করেনি। এইজন্যই *চৈতন্যভাগবত*-এ চৈতন্যের দিব্যলীলার কাহিনি বর্ণিত হলেও সেকালে বাঙালির জীবনযাত্রা ও জীবনচর্চার দর্পণ হয়ে উঠেছে। নবদ্বীপ লীলায় বর্ণিত নামসংকীর্তনের প্রচারক চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবরা শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নামগান করতেন, কিন্তু কাজীর নিষেধাজ্ঞায় রুষ্ট হয়ে চৈতন্যদেব প্রথম সকল বৈষ্ণব নগরিয়াকে একত্রিত করে নগরে নগরে নামগান করে বেড়িয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি প্রথম বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের পথচলা শুরু করেছিলেন। চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের পন্থা নামসংকীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তিকে জনসাধারণের হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছিল। এই লীলায় কাজী দলন প্রসঙ্গে নগর সংকীর্তনের প্রচলন পেয়েছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে চৈতন্যদেব শুরু করেছিলেন এক অভিনব ভক্তি আন্দোলন। দলবদ্ধভাবে হরিনাম সংকীর্তন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যৌথ ধর্মীয় উপাসনা। ধর্মকেন্দ্রিক সাম্য এসেছিল মানব সমাজে। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও প্রথম সংঘবদ্ধভাবে সমবেত হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে জনমত সংগঠনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এই গণআন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন।

চৈতন্যদেবের কাজীর নির্দেশ অমান্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রথম গণবিপ্লব ও আন্দোলনের বীজ। চৈতন্যদেব কেবল ধর্মপ্রচারক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক অনন্য সমাজ বিপ্লবী। ধর্মে, ভাষায়, সাহিত্যসংস্কৃতিতে, সমাজ এবং জীবনচর্চায়, দর্শন ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় তিনি ছিলেন পুরোধা। স্থবির জনজীবনের ভিত গিয়েছিল কেঁপে। তিনি জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন – 'চণ্ডালপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ'[১০] অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ নয়,

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই হরিসেবা ও নামগান করার অধিকারী। চৈতন্যদেব এর মাধ্যমে মানুষ মানুষে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা মুছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেব বলেছেন — যার থেকে কৃষ্ণভক্তি জন্মাবে সেই তোমার গুরু। সে হীনজাতের থেকে হোক পুত্র কিংবা পুত্রসমূহ —

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়।। [১১]

মধ্যযুগের সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেবের এই ঘোষণা বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মধ্যযুগে নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বর্তমান নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটা আলাদা। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ভাঙনে কিছু পীঠস্থান গঙ্গায় তলিয়ে গেছে, তবে নবদ্বীপ যে নানান সাংস্কৃতিক পীঠস্থান তার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। *চৈতন্যভাগবত*-এ নবদ্বীপের বর্ণনায় পাওয়া যায় পাড়ায় পাড়ায় বহু জাতির বসতি ছিল, তারা নানান জাতের। তাই কর্মজীবনও ছিল নানান ধরনের। শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলিক, বাদ্যকার, সর্পদংশনের চিকিৎসক, বৈদ্য, খোলা বেঁচা শ্রীধর ভাঁট ও বণিকদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য ছিল বেশি। নিম্ন উপজাতির বাস নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় যেমন ছিল, তেমন গ্রামেও ছিল, যার উল্লেখ বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল*-এ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক কাঠামো এই ছিল যে মানুষের সঙ্গে কোনও সামাজিক সঙ্গতি প্রকৃত অর্থে ছিল না। কেবল হাট-বাজারে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কেনাবেচার সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সামাজিক সংগঠন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডর গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে সামাজিক বন্ধনকে শিথিল করে দিতে পারেননি। চৈতন্যদেবই প্রথম সংস্কারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের বন্ধনকে শিথিল করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে ভাঙা মাটির পাত্রে জলপান করে ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে এই দৃষ্টান্তই তৈরি

করতে চেয়েছিলেন সকল জাতির সকল মানুষই সমান। জাত-পাতের ধর্ম নয়, মানবধর্মই বড় ধর্ম।

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের নবদ্বীপের সমাজ বর্ণনায় তৎকালীন সময়ে পাষণ্ডরা কীভাবে জনসাধারণের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত তার ছবি জগাই-মাধাইয়ের আচরণে দেখা যায়—

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহ-দাহ সর্বক্ষণ।।
দিয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল।
মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল।।
দুইজনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায়।।
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেই খানে নিত্যানন্দ-হরিদাস সঙ্গ।।[১২]

এমন কোনও পাপ নেই যা এই জগাই-মাধাই করেনি। মধ্যযুগের সমাজে পারিবারিক শাসনকাঠামো ঠিক না থাকার জন্য কিছু মানুষ বিপথে চলে যেত, আবার অন্যদিকে আর্থিক এবং ক্ষমতার দম্ভ থাকলে এমন অধঃপতন ঘটত। *চৈতন্যভাগবত*-এর মধ্যলীলার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রেমভক্তি জগাই-মাধাইকে নূতন ও সুস্থপথে সহজভাবে বাঁচার দিশা দেখিয়েছিল এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব নবদ্বীপ লীলায় তন্তুবায়, গোয়ালা পাড়া, গন্ধবণিক, মালাকার ঘর, তাম্বুলির ঘর প্রমুখের পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ভেঙে গৌরাঙ্গ এই নিম্ন উপজাতির বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আফগানদের বঙ্গে সামরিক অভিযানের ফলে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার। তাই সমাজে জীবনাচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই পরিবর্তনে সুলতানরা

ভারতে তথা বঙ্গে পূর্বকাল থেকে প্রচলিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মনিয়োগ কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাননি। সেই সময় অর্থনীতির উন্নয়নে তুর্কি আফগানরা বহির্বাণিজ্য শুরু করেছিল। বহির্বাণিজ্যের একটি ঘাঁটি ছিল নবদ্বীপ, *চৈতন্যভাগবত*–এ বৃন্দাবনদাস এর উল্লেখ করেছেন।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের ভূমিকা

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সহজেই লক্ষ করা যায়। *চৈতন্যভাগবত*-এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব নেতৃত্বের হুঙ্কার গর্জন, অধিকারের লড়াই ইত্যাদি প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ সহনশীলতা, কোমলতা ও সম্পর্কের বন্ধন গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশি। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সমাজের প্রতি ব্যক্তিমানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। সেই ইঙ্গিত এই কাব্যগুলিতে ফুটে উঠেছে। যেমন চৈতন্যদেবের কাজীদলন ঘটনাটিকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনাটিকে প্রেমধর্ম তথা ধর্মসমন্বয়ের ঘটনারূপে উপস্থাপন করেছেন। তাই একই ঘটনা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ কাজীদলন ঘটনাটিকে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সময় শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক ভালো ছিল না। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে দেখিয়েছেন হরিসংকীর্তনের দল ভারী হয়ে উঠলে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের দ্বারা হিন্দু জাতি গোষ্ঠীর উত্থানের ভয়ে মুসলমান শাসক কাজি কীর্তন বন্ধের ফরমান জারী করেছিলেন। পাষণ্ডী হিন্দুরাও কাজীর অনুচর রূপে বিরোধিতা করতেন। কাজী বলেন — "মোর বোল লংঘিয়া কে করে হিন্দু-আনি।"[১৩] নবদ্বীপের নিরীহ হিন্দুরাও ভীত হয়ে কীর্তনীয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করতেন। তারা বলতেন—

এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক বিনাশ।
ইহা সবা হতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।।[১৪]

সেই পরিস্থিতিতে চতুর্দিকে রটানো হয়েছিল নৌকাযোগে সামরিক বাহিনী এসে হিন্দুনিধন ও ধর্মান্তরকরণ করবে। চৈতন্যদেব এই পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম গণশক্তির সাহায্যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবেই বৃন্দাবনদাস প্রথম গণজাগরণের ছবিটি তুলে ধরেছেন। কাজীদলন প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত সেই ছবিতে দেখা যায় চৈতন্যদেব কীর্তনের দল নিয়ে কাজীর বাড়ির দিকে ছুটছেন আর বলছেন —

ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা।।
নিযবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধিয়াছি যে কালযবন।।
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ঘর ভাঙ্গ বোলে বার বার।।[১৫]

এইভাবেই কাজী দলনের ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনদাস দেখিয়েছেন চৈতন্যদেব একজন অবতার। তিনি দুষ্টের দমন করার জন্য এবং সাধুদের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাছাড়া সেই সময় শাসক ও শোষিতের মধ্যে যেভাবে তিক্ত অবস্থায় সম্পর্ক পৌঁছেছিল, গণঅভ্যুত্থান ছিল অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কাজী দলনের ঘটনাটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ঘরে ঘরে যখন সংকীর্তনের ধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনি বেজে ওঠে, তখন কাজী বলছেন —

এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কোন বল জানি।”

কাজী এই ঘটনার ক্ষমা করে সাবধান করে জানিয়েছিলেন যে যদি কেউ হিন্দুয়ানি করে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে জাতিনাশ করে দণ্ড দেবেন। কাজীর এই আদেশ চৈতন্যদেব জানতে পেরে বৈষ্ণব মণ্ডলীকে আদেশ দিলেন —

নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।।
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।।[১৭]

এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হরিদাস, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে তিনটি কীর্তন দল গঠন করেছিলেন। সকলকে নিয়ে তিনি নগরভ্রমণ করে কাজীর দুয়ারে উপস্থিত হলে কাজী ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। সেখানে চৈতন্যদেব অবস্থান সত্যাগ্রহ শুরু করে একজন ভদ্রলোককে দিয়ে কাজীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন —

দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইয়া প্রভু সম্মান করিয়া।।[১৮]

অতিথিকে দেখে লুকিয়ে পড়া এ কাজীর কেমন ধর্ম চৈতন্যদেব জানতে চাইলে কাজী জানান, তিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁকে শান্ত করতে কাজী লুকিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পরিস্থিতিতে উভয়ের মধ্যে মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এইভাবেই বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজীর রাজত্বে হরিসংকীর্তন বিধিসম্মত হয়েছিল এমন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কাজীদলন ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে — অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে জনমত তৈরি করতে হয়, চৈতন্যদেব তারই ইঙ্গিত আধুনিক যুগের কাছে রেখে গেছেন। সেইসময় সমাজে একদল মানুষ উপেক্ষিত হচ্ছিলেন, তাঁদের একত্রিত করে জনসংযোগ বৃদ্ধি করাই চৈতন্যদেবের কর্মকাণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষত হিন্দুধর্মের অবক্ষয়কে চৈতন্যদেব যেভাবে রোধ করেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু নিমাইয়ের শৈশবলীলা ও শিক্ষা

বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণের গোকুললীলার বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের শৈশবলীলা বর্ণনা চৈতন্যদেবের শৈশবলীলার প্রায় পরিপূরক। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর দশম, ও একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদে রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (১৪৮০)। বৃন্দাবনদাস *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের শৈশবলীলায় কৃষ্ণের গোকুল লীলার ছাপ থাকলেও আসলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন দুষ্টুমি শিশুদের সাধারণ ধর্ম। শিশুরাই পারে সামাজিক সংস্কার এবং জাতিভেদপ্রথার বাইরে এনে সকল মানুষকে এক ছাদের তলায় একত্রিত করতে।

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়।।[১৯]

অর্থাৎ শিশুদের যে ভয়ডর কম হয়, তা বালক নিমাইয়ের আচরণের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবনদাস ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনই অন্যদিকে দেখা যায় শিশুমনে সমাজের জাতপাতের কোনও ছাপ পড়ে না। যে কোনও বাড়ি থেকে খেয়ে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করে। উচ্চবর্ণ হোক আর নিম্নবর্ণ — কোনও বন্ধন শিশুদের আটকে রাখতে পারে না। সেই আনন্দ যে কতটা মজার তা নিমাই তাঁর শিশু বন্ধুদের দিয়েছিলেন।

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।।[২০]

আসলে শিশু বয়স থেকেই জাতপাতের ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তারা নিজের জাতের বাইরের কারও সাথে মিশবে না, কারও বাড়িতে অন্নগ্রহণ করবে না। শিশু নিমাই এই শিক্ষার বাইরে গিয়েছিলেন। তাই সকল জাতির শিশুরা হয়েছিল তার বন্ধু। এইভাবেই প্রথম মধ্যযুগের সমাজে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়েছিল অতি সন্তর্পণে — বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এর নবদ্বীপ লীলায় এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এর আদিলীলায় শিক্ষালাভের বর্ণনায় চৈতন্যদেব অর্থাৎ শিশু নিমাইয়ের শৈশবলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা ছাড়া সমাজে

সচেতনতা জাগানো সম্ভব ছিল না। ছোটো শিশুদের শিক্ষা না দিলে তাদের সমাজের ভালোমন্দের জ্ঞান আহরণ সম্ভব ছিল না। আজ থেকে পাঁচশ তিরিশ বছর আগে শিশু নিমাই সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে দুষ্টকর্মের মধ্য দিয়ে পিতা-মাতার অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। দাদা বিশ্বরূপ শিক্ষালাভের শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ করে চলে গেলে নিমাইয়ের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শিশু নিমাইয়ের পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করেছিলেন —

শচীপ্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এই পুত্র না রহিবে সংসারভিতর।।
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র।।
সর্বশাস্ত্র মর্মজানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইল বাহির।।
এই যদি সর্বশাস্ত্রে হৈবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান।।
এই পুত্রে সবে দুইজনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুইজনের মরণ।।
অতএব ইহার পড়িয়া কার্যনাঞি।
মূর্খ হইয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।।[২১]

পুত্র নিমাইয়ের বুদ্ধি প্রশংসায় মাতা শচীদেবী গর্বিত। তাই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের পড়তে যেতে না দেওয়ার প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারছিলেন না —

শচী বলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মূর্খ্যের কন্যাও নাহি দিবে কোনজনে।।[২২]

শচীদেবী স্বামীর সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন কারণ, স্বামী বলেছিলেন—

এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র কহিলাম আমি।।
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎতিলেক চিন্তা নাহি উহার।।
আমার সবারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।

কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা।।
পড়িয়া নাহিক কার্য বলিল তোমারে।
মুর্খ্য হউ পুত্র মোর, রহু মাএ ঘরে।।
এত বলি পুত্রেরে ডাকিল বিপ্রবর।
পুত্রে বোলে শুন বাপ আমার উত্তর।।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার।।
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাহা দিব আমি।
গৃহে বাস পরম মঙ্গলে থাক তুমি।।[২৩]

—পিতা-মাতার অন্ধস্নেহ এভাবে সন্তানের শিক্ষালাভে বাধার সৃষ্টি করে। সন্তানের ভালোমন্দ জ্ঞানলাভ হয় না। মধ্যযুগ থেকেই ঘরে ঘরে শিশুশিক্ষার বিরোধ তৈরি হয়েছিল। শিশুশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ সেইসময় দাঁড়িয়েও অনেকে মানতে পারতেন না। শিশু নিমাই যখন তার মাকে জানান তাকে পড়তে না দেওয়ার কারণে ভালোমন্দ জ্ঞান আহরণ হয়নি—

শিশুগণ জানাইল গিয়া শচীস্থানে।
নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ির আসনে।।
মায়ে আসি দেখিয়া করয়ে হায় হায়।
এ স্থানেতে বাপ বসিবারে কি জুয়ায়।।
বর্জ্য হাঁড়ি ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার কিনা জন্মিল জ্ঞান।।
প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমতে।।
মুর্খ আমি না জানি এ ভালোমন্দ স্থা।
সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।।[২৪]

শিশু নিমাইয়ের শিক্ষার আগ্রহ দেখে প্রতিবেশীরা পিতামাতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে শিশু নিমাই আনন্দিত হয়েছিলেন –

পড়িতে পাইলা প্রভু বাপের আদেশ।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষ।[২৫]

চৈতন্যদেব শিশুকাল থেকে বুঝেছিলেন শিক্ষা ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ হয় না।

নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ বর্ণনা

বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিতের বিবাহের বর্ণনা করেছেন যা মধ্যযুগের সামাজিক লৌকিক আচারের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। মধ্যযুগে পিতা ও মাতার নির্বাচিত পুত্র ও কন্যার বিবাহে সমাজবন্ধন সুদৃঢ় হত। বিবাহের প্রধান অঙ্গ ছিল অধিবাস। বিবাহের পূর্বদিন অধিবাসের সময় ব্রাহ্মণ-স্বজনদের গন্ধমালা, চন্দন, পান ইত্যাদি দিয়ে তুষ্ট করা হত, ভোজনের ব্যবস্থাও থাকত। মধ্যযুগে বিবাহরীতি নানান সংস্কারে পূর্ণ ছিল। বেদমন্ত্র উচ্চারণ, *রামায়ণ* পাঠ, ডুবডুবি, ঢাক, বাঁশি, মৃদঙ্গ, করতাল, সানাই ইত্যাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহমণ্ডপ মুখরিত থাকত। বিবাহের দিন পাত্র ও কন্যা উপবাসে থাকতেন। পাত্র বিবাহের দিন ব্রাহ্মণদের গন্ধ-চন্দন-মালা-তাম্বুলের দ্বারা তুষ্ট করতেন। বিবাহের পূর্বে নান্দীমুখ পালন ছিল পবিত্র রীতি। চাঁদোয়া খাটিয়ে বিবাহমণ্ডপ সুসজ্জিত করা হত। বিবাহের মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ ছিল পূর্ণ ঘট, দীপ, ধূপ, ধান, দধি, পান ও আম্রপল্লব। এইগুলি আজও সামাজিক বিবাহে মঙ্গলবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্পনার সাহায্যে বর ও কন্যার গৃহ সুচিত্রিত করা হত। তৎকালীন সময়ে সাতদিন ধরে সধবাদের উলুধ্বনিতে বিবাহবাসর আনন্দে মুখর হয়ে থাকত। নিমাই পণ্ডিতের দুই বিবাহেই মাতা শচীদেবী তৎকালীন স্ত্রীআচারের নিয়ম অনুসারে সধবা নারীদের খই, মালা, সিঁদুর ও তেল দিয়ে সম্মান করেছিলেন। বিবাহের এই সমস্ত সামাজিক রীতি নিমাই পণ্ডিতের দুটি বিবাহে পালিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের সমাজে প্রেম বা ভালোবাসা বিয়ের আগে ছিল আচারবিরোধী অপরাধ। বিবাহবন্ধন ছিল পুতুল খেলা। বিবাহের ব্যাপারে পাত্র বা পাত্রীর মতের কোনও মূল্য ছিল না। সামাজিক এই সংস্কারকে ষোড়শ শতকে দাঁড়িয়েও কোনও মূল্য দেননি চৈতন্যদেব। তাঁর প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছিলেন নিজের পছন্দ করা, মায়ের কাছে সেই মতামত জানাতেও তিনি সঙ্কোচবোধ করেননি। নিমাই নবদ্বীপের বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে গঙ্গাস্নানে যেতে দেখেছিলেন। প্রথম দর্শনেই নিমাই লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন—

নিজলক্ষ্মী চিনিয়া হাসিল গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুর পাদদ্বন্দ্ব।।[২৬]

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে পুত্রের মতের মূল্য দিয়েছেন মাতা শচীদেবী। চৈতন্যদেব নিজে থেকেই মাতা শচীকে নিজের প্রথম বিবাহ সম্পর্কে বলেছিলেন —

জননীরে হাসিয়া বলেন সেই ক্ষণে।
আচার্যেরে সম্ভাষা ভাল না করিলা কেনে।।
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি কহিলেন কথা।।
শচী বলে বাপকালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ বলিল এই আমি।।
আইর চরনধূলি লইলা ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ ভবন।।
বল্লভ আচার্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহুমান্য করি বসাইলেন আসনে।।
আচার্য বলেন শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন।।
মিশ্র পুরন্দর পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্বগুণের সাগর।।[২৭]

বল্লভাচার্য কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে আনন্দিত হলেও পণকেন্দ্রিক এক বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। পণ ছাড়া মধ্যযুগে বিবাহ সম্পূর্ণ হত না। কিন্তু এই গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে পণ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না —

শুনিয়া বল্লভাচার্য বলেন হরিসে।
সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে।।
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে।।
তবে সে সেহেন আমি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুই ইহা করহ সর্বথা।।
সবে একবচন বলিতে লজ্জা পাই।

আমি যে নিধন কিছু দিতে শক্তি নাই।।
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সব তুমি আনিবে মাগিয়া।।[২৮]

বল্লভাচার্য কন্যার বিবাহের পণ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তা জানাতেও সঙ্কোচবোধ করেননি। নিমাই পণ্ডিত নিজের বিবাহের মধ্য দিয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন এমন ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ পাওয়া যায়। নিমাইয়ের বিবাহ বর্ণনায় দেখা যায় গোধূলিলগ্নে নিমাই পণ্ডিত দোলায় করে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী দোলা থেকে বরকে কোলে করে বিবাহ মণ্ডপে উপস্থিত করা হয়েছিল। বিবাহাচার অনুযায়ী নিমাই পণ্ডিতের চরণে লক্ষ্মীদেবী মালা দিয়েছিলেন।

প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর নিমাই পণ্ডিত বুঝেছিলেন সাংসারিক মোহ অনিত্য। মাতৃআদেশে নিমাই পণ্ডিত কুলে-শীলে সদাচারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেছিলেন। মধ্যযুগে অনেকসময় সম্পত্তিতে বিত্তবান পুরুষেরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবাহ খরচ বহন করতেন। নিমাইয়ের ভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান নিমাইয়ের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন। মায়ের অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে চার বছর সংসার করলেও নিমাই সাংসারিক বন্ধনে জড়ান নি। তিনি কাটোয়ায় কেশভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেছিলেন। গয়া থেকে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করে ফিরে আসার পর থেকে চৈতন্যদেবের এই বৈরাগ্যভাব এসেছিল। গয়াতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গেতাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঈশ্বরপুরী ছিলেন তাঁর মন্ত্রগুরু।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কর্তব্যবোধ

চৈতন্যচরিতামৃত-এর অন্তঃলীলার নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহাপ্রভু সপার্ষদ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা গুপীনাথ রায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের (শাসনকাল ১৪৯৭-১৫৪০) রাজস্ব দুই লক্ষ টাকা নষ্ট করে ফেলায় তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। রাজকর মকুবের আবেদন করে

গুপীনাথকে বাঁচানোর জন্য চৈতন্যপার্ষদেরা তাঁকে অনুরোধ করলেও তিনি রাজাকে অনুরোধ করতে সম্মত নন; কারণ গুপীনাথ রাজকর নষ্ট করে অন্যায় করেছেন —

শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ।।
রাজা বিলাত সাধি খায় নাহি রাজ ভয়।
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়।।
যেই চতুর সেই করুক রাজ বিষয়।
রাজদ্রব্য সাধি পায় তাহা করে ব্যয়।।[২৯]

অপরাধ করলে যেমন শাস্তি অপরাধীর প্রাপ্য, তেমনই অন্যের অর্থ দিয়ে দানধ্যান করা অন্যায়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনযাপন করা উচিত। সুখ বা আতিশয্য, জ্ঞান বা যশ – কোনো লোভই ভালো নয়। চৈতন্যদেব তাঁর পারিষদদের জানান —

শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ যবে যাই রাজ স্থানে।।
তোমা সবার এই মত রাজার ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই মুঞি আঁচল পাতিয়া।।
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে দিবে কেন দুই লক্ষ কাহন।।[৩০]

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সামর্থের বাইরে চাওয়া ধর্মসম্মত নয়। চৈতন্যদেব এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন যতটুকু নিজের আছে ততটুকুই ধর্মসম্মত ভাবে ব্যয় করা উচিত। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র সেবক গোপীনাথকে মুক্তি দিয়ে রাজস্বের অর্থ অপব্যয় না করতে সাবধান করে দেন। গোপীনাথ রায়কে প্রতাপরুদ্র বলেন —

রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
মাল জাঠ্য দণ্ডপাঠ তোমায় বিষয় দিল।।
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হইতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।।[৩১]

অনুমান করা যায়, তৎকালীন সময়ে প্রতাপরুদ্র ছিলেন প্রজাবৎসল। তাঁর এই ঔদার্য মহাপ্রভুকে ভক্ত বাৎসল্যের সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়েছিল। গোপীনাথ রায় চৈতন্যদেবের কাছে ধনৈশ্বর্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পথের দিশা সন্ধান চেয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব গৃহীভক্ত এবং সমাজের কথা ভেবে গোপীনাথের ঐশ্বর্য্য থেকে মুক্তি না ঘটিয়ে বলেছিলেন —

প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ।।
মহাবিষয় কর কিম্বা বিষক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ তোমার নিজ দাস।।
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন।।
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয়।।
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায়।।[৩২]

গোপীনাথের প্রতি চৈতন্যদেবের এই আদেশ গৃহীভক্তদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

চৈতন্যচরিতামৃত এবং *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অধ্যায়ে মায়ের প্রতি কর্তব্যপালনকে সবচেয়ে বড় ধর্ম রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। *চৈতন্যভাগবত*-এ বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় দেখা যায় শচীপুত্র নিমাই পণ্ডিত মায়ের আজ্ঞা নিয়েই সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও মাতার প্রতি সমস্ত কর্তব্য পালন করেছেন। তবে সন্ন্যাস-পরবর্তীকালে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি কখনও নবদ্বীপে পা দেননি। তিনি অদ্বৈতাচার্যের শান্তিপুরের আশ্রমে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এছাড়া নিত্যানন্দ এবং নিজের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের দ্বারা মায়ের খোঁজ নিয়েছেন এবং নিজের সংবাদ পাঠিয়েছেন মায়ের কাছে। বৃন্দাবনে বাস করার ইচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের অনুরোধে চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করেছেন। এইভাবে চৈতন্যদেব সংসারধর্মের কর্তব্য এবং সন্ন্যাসধর্মের কঠোর ব্রত রক্ষা করেছেন।

শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।।
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত্য।।
দশ দিন অন্তর বা কি এখনে আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি।।
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার।।
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার।।[৩৩]

বৃন্দাবনদাসের এই ব্যাখ্যা মধ্যযুগের সমাজের ব্যক্তিমানুষের কর্তব্যবোধকে সচেতন করেছিল।

চৈতন্যচরিতামৃত-এ প্রাজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের কথা বলতে গিয়ে দেখিয়েছেন, মায়ের আজ্ঞা পালন করা বড় ধর্ম। এই গ্রন্থে দেখা যায় চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন –

শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিঞা।।
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।।
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন।।
কান্দিয়া কহেন শচী বাছা-রে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।।
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ।।
প্রভু ত কান্দিয়া বলে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।।
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।

কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে।।
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস।।
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিমু।
তুমি সেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু।।[৩৪]

আসলে ধর্মসাধনার পথে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। দেশসেবা, ধর্মসেবা, সমাজসেবা থেকে বড় ধর্ম হল মাতৃসেবা ও মায়ের প্রতি আজ্ঞাপালন করা। চৈতন্যদেবের মাতৃধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজধর্ম পালন যাতে রক্ষা পায় তারই দায়ভার মাতা এবং ভক্তবৃন্দের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মা এবং ভক্তবৃন্দকে যেমন ছাড়তে পারবেন না, তেমনই আবার নিজের ধর্ম পদ থেকেও সরে আসতে পারবেন না —

যদ্যপি সহসা মুঞি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।।
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইঞা।।
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম।[৩৫]

কর্তব্যপালন করতে গিয়ে নিজের কর্মপথ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া ধর্মসম্মত নয়। পুত্র কেবল পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হবেন তা নয়, পুত্রের সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসার প্রতি সমান দায়িত্ব এবং কর্তব্য পরায়ণ হওয়া পিতামাতারও কর্তব্য —

শুনি সচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা।
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।।
তায় নিন্দা হয় যদি মেহো মোর দুখ।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।।

নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়।
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর।
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।।
গঙ্গাস্নানে কভু হৈবে তাঁর আগমন।
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি।।[৩৬]

চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করে কর্তব্যপালনের সঙ্গে ধর্মপালন করেছিলেন। তিনি পুরীতে থেকে বঙ্গের মানুষদের কর্মের এবং ধর্মপালনের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন ।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যবন হরিদাসের ভূমিকা

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে যে নবচেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিলেন সেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রয়াস শুরু করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। অদ্বৈত আচার্য ও হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণবভক্ত এবং সন্ন্যাসীদের পাঠের বিষয় ছিল *শ্রীমদ্ভাগবত*। পঞ্চদশ শতকের প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্মের সার কথা ছিল জ্ঞানলাভ নয়, প্রেমভক্তি লাভ। হিন্দুদের বৈষ্ণবভক্তির তুলনায় যবন হরিদাসের বৈষ্ণবভক্তি কোনও অংশেই কম ছিল না। বরং সাধারণ হিন্দু বৈষ্ণবের পক্ষে শুধুমাত্র ভক্তিপ্রেমের দ্বারা এমন কঠোরভাবে বিষ্ণুর উপাসক হওয়া সম্ভব ছিল না। যবন হরিদাস একাগ্রচিত্তে তিন লক্ষ বার কৃষ্ণনাম করতেন। হিন্দু সমাজ ছিল মধ্যযুগের মুসলমান শাসকের শাসনাধীন। ঐ সময় মুসলমান শাসকের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবারের এবং নিজের জীবন রক্ষার্থে কিছু হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছিলেন। তবে কেউ কেউ যশ এবং লোভের বশে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে যবন হয়েও হরিদাস হরিনাম করে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে বেরিয়ে মুসলমানের কঠোর সংস্কার নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। হিন্দুদের দেখলে মুসলমানরা যেমন অন্ন-জল ফেলে দিতেন, তৎকালীন সময়ে তেমনই হিন্দুরাও মুসলমানদের দর্শনে অন্ন-জল ফেলে দিতেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের

হিন্দু বা মুসলমানদের ছোঁয়ায় দিলে গঙ্গাস্নান করতো। সমাজের এই পরিস্থিতিতে সামাজিক সংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথা যখন চরম পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে হরিদাস বিষ্ণুভক্তি ও হরিনামে গ্রাম মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই ধর্মাচরণ যেমন মুসলমানরা মেনে নিতে পারেননি, তেমনই অবৈষ্ণব হিন্দুরাও মেনে নিতে পারেননি।

বুড়ন গ্রামনিবাসী যবন হরিদাস ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে এসে বসবাস শুরু করেন। সেইসময় শান্তিপুর, নবদ্বীপে শ্রীনিবাস ও অদ্বৈত আচার্যের সাহচর্যে বৈষ্ণবধর্মের উপাসনা প্রসার লাভ করেছিল। ঐ সময় নদীয়ার অবৈষ্ণব হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে হরিনামগানের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কাজী যবন হরিদাসের এই অনাচারের বিরুদ্ধে মুলুকপতির কাছে কঠোর শাস্তির আবেদন করলে তিনি হরিদাসকে ধরে এনে ধর্মবিরোধী কাজ করতে নিষেধ করে এবং কলেমা উচ্চারণ করতে বলেন। হরিদাস মৃদু প্রতিবাদে বলেন—

বলিতে লাগিলা তবে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সবারেই একই ঈশ্বর।।
নামমাত্র ভেদ কহে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।।[৩৭]

জাতিগত দিক থেকে ধর্মীয় সাধনা আপাতভাবে বড় ধর্ম হলেও আসলে সব ধর্মের সারসত্য হল মানবধর্ম। হরিদাসের এই উপলব্ধি ঘটেছিল। তিনি হরিনাম করলেও নিজেকে হিন্দু বলে দাবী করেন নি এবং হিন্দু মন্দিরেও প্রবেশ করেননি। আবার যবন হয়েও কখনও নামাজ পড়েননি এবং মসজিদেও যাননি। একাগ্রচিত্তে ভক্তি দিয়ে কঠোরভাবে ঈশ্বরসাধনার মাধ্যমে মানবসেবা করা যায় হরিদাসের জীবনাচার্যের মধ্যে দিয়ে সেই বর্ণনাই ফুটে উঠেছে। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস মধ্যযুগের সমাজে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নিদর্শন রূপে হরিদাসের জীবনাচরণ তুলে ধরেছেন। মুসলমানরা হরিদাসের কৃষ্ণনাম স্মরণ মেনে নিতে পারেননি। মুলুকপতির অনুমতিতে কাজীর আদেশে পাইকরা বাইসবাজার ঘুরে ঘুরে হরিদাসকে

চাবুক মারলেও তিনি নিজ সংকল্পে অবিচল ছিলেন। সহৃদয় মুসলমানরা পাইকদের কাছে হরিদাসের জীবনভিক্ষা চেয়েছিলেন –

কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে।।
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহা ক্রোধমনে।।[৩৮]

দুর্বিনীত পাইকরা তাদের কথার মর্যাদা দেননি। নানান বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হরিদাস হরিনাম সংকীর্তন থেকে বিরত হননি। হরিদাস অদ্বৈত আচার্যের সান্নিধ্যে এসে হরিনামে শান্তিপুর মাতিয়াছিলেন। যবন হয়েও হরিদাস অদ্বৈতগৃহে অন্ন গ্রহণের অধিকারী হয়েছিলেন। উদার অদ্বৈতাচার্য বিশ্বাস করতেন যে সকলেরই হরিনাম করার অধিকারী এবং প্রত্যেক গৃহস্থের সবচেয়ে বড় ধর্ম হল অতিথিসেবা। বিপ্র, যবন বা নিম্নজাতি যাই হোক না কেন অতিথি ভগবানের অংশ অর্থাৎ অতিথি নারায়ণ। হিন্দুধর্মের প্রথাগত সংস্কারের বাইরে গিয়ে অদ্বৈত আচার্য যবন হরিদাসকে অতিথির সম্মান দিয়েছিলেন। হরিদাস শ্রীনিবাসগৃহে নামগান করার অধিকার পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাসের লেখনীতে মধ্যযুগের সামাজিক সংস্কারকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়াস সূচিত হয়েছিল।

হরিদাস নিত্যানন্দের সঙ্গে নগরে নগরে ভ্রমণ করে হরিনাম করেছেন। কাজীদলনের সময়ে হরিদাস দলের আগে নৃত্য করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবের আলিঙ্গন লাভ করেছেন। এসব স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও হরিদাসের 'যবন' পরিচিতি মধ্যযুগের সমাজ থেকে যেমন মুছে যায়নি, তেমনই মহাপ্রভুর ভক্তপরিকরগণ যবন হরিদাসের ধর্মীয় স্বীকৃতি মুছে ফেলে পঙক্তিভোজন করতে পারেন নি। এমন ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ পাওয়া যায়।

ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য গোঁসাঞি।।
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে।

দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ।।[৩৯]

হরিদাস চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস আশ্রম ও গৃহাশ্রমের অন্যতম পরিকর ছিলেন। বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত আকারে নবদ্বীপ লীলার বর্ণনায় হরিদাসের সঙ্গে হিন্দুসমাজের সম্পর্ক গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের নীলাচল বর্ণনায় যবন হরিদাসের প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে হরিদাস নীলাচলে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। হরিদাস 'সাচ্চাপীর' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। হরিদাস বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হয়েও বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে নিজেকে অস্পৃশ্য নীচ জাতি বলে স্বীকার করতেন। পুরীতে হরিদাস ও চৈতন্যদেবের মিলনে প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করতে গেলে হরিদাস নিজেকে নীচজাতীয় বলেন —

হরিদাস কহে প্রভু না দুইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।।[৪০]

হরিদাসের বিষ্ণুভক্তি ছিল এমন কঠোর এবং নিষ্ঠাপূর্ণ যে সাধারণ হিন্দু এবং বিপ্ররাও এত বেশি ভক্তিপরায়ণ হতে পারেননি। তাই চৈতন্যদেব স্বয়ং বলেছেন —

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন।।[৪১]

হরিদাসের জীবনাচরণ ধর্মপালন ও কর্মপথ মধ্যযুগের সমাজের জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক সংস্কার ও ধর্মপালনের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায়ে হরিদাসের মৃত্যুর সময় পরিকরসহ চৈতন্যদেব হরিনামকীর্তন করেছিলেন। মৃত্যুর পর চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তেরা হরিদাসের কবরে মাটি দেন। চৈতন্যদেব নিজে ভক্তদের সঙ্গে

মাধুকরী করে হরিদাসের মহোৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। মানবধর্মই পরম ধর্ম রূপে কৃষ্ণদাস স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

গৃহী বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের বৈষ্ণবধর্মে অবস্থান

বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লাভের বর্ণনা বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* চরিতগ্রন্থে ফুটে উঠেছে। তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন মুসলিম শাসকের অত্যাচার এবং ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় গোঁড়ামীর হাত থেকে বাঁচতে নিরীহ মানুষ তাদের গৃহে গৃহে বিষ্ণুর উপাসনা শুরু করেন। সেই সময় থেকেই গৃহী বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নবদ্বীপে বসবাসকারী বেশিরভাগ ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে। এঁরা অনেকেই ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শ্রীবাস আচার্য, অদ্বৈত আচার্য, নীলাম্বর মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্র, বল্লভাচার্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত প্রমুখ ব্রাহ্মণরা যেমন নবদ্বীপে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, তেমনই নিম্নজাতির খোলাবেচা শ্রীধর, মুকুন্দ ঘোষ, মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব প্রমুখ ছিলেন গৃহী বৈষ্ণবও ছিলেন। ভক্তিভরে বিষ্ণুসেবা করার পাশাপাশি গৃহের সকল দায়িত্ব পালন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অতিথি আপ্যায়ন করা গৃহী বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান ধর্ম। নিরপেক্ষভাবে অতিথি সেবা করতে গিয়ে হয়তো অনেক সময় অবৈষ্ণব এবং তৎকালীন সমাজপতিদের হাতে তাদের লাঞ্ছিত, এমন কি অনেক সময় সমাজচ্যুতও হতে হত। যেমন অদ্বৈত আচার্য যবন হরিদাসকে গৃহে স্থান দেওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের কথাও বলেছেন। তবে তাঁর রচনায় গৃহী বৈষ্ণবের আচার-আচরণের বর্ণনা যতটা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আচার-আচরণের বর্ণনা ও তাদের সমাজের প্রতি প্রভাব ততটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে গৃহী বৈষ্ণবের পাশাপাশি সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের জীবন আচরণ ও সমাজে তাদের কর্মজীবনের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ একদিকে যেমন রাজা প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দ

রায় প্রমুখের গৃহী বৈষ্ণব জীবনের আচার-আচরণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনই অপরদিকে কাশীর বৈদিক সন্ন্যাসীদের জীবন-আচরণ স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণবরা সন্ন্যাসগ্রহণের পর কখনও পারিবারিক, সাংসারিক মায়ার মধ্যে জড়িয়ে থাকেন না। মাতৃভূমি আর পিতৃপরিচয় ত্যাগ করে তাঁরা নতুন নামে পরিচিত হন। জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ ভাই নিমাইয়ের থেকে দশ-বারো বছরের বড় এবং বিদ্যাশিক্ষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শান্ত, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি শ্রীবাস গৃহে অদ্বৈত আচার্য সহ নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীকে নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন। নবদ্বীপের অবৈষ্ণবদের কৃষ্ণনাম শোনার প্রতি অবজ্ঞা তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তাই তিনি নবদ্বীপের অবৈষ্ণবদের কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য মেনে নিতে না পেরে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নাম ছিল শঙ্করারণ্য। তাঁর সঙ্গে পুরী সম্প্রদায়ের পরমানন্দ পুরীর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সাক্ষাৎ হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারতভ্রমণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবদের প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি তাঁদের সংসার নির্লিপ্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বিশেষ কোনও বস্তুর ওপর যেমন মায়া থাকা উচিত নয়, তেমনই সাজসজ্জায় তেমন কোনও আড়ম্বর থাকা উচিত নয়। চৈতন্যদেব কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে নতুন বস্ত্র নিতে, আড়ম্বরপূর্ণ অন্ন গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেও ভক্তদের পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় দেখা যায় চৈতন্যদেব দক্ষিণভারত ভ্রমণ থেকে নীলাচলে ফিরে আসার পর ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম পড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। ভারতীর এই সাজসজ্জার আড়ম্বরতায় চৈতন্যদেব অন্তরে দুঃখ অনুভব করে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। চৈতন্যদেব মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতী গোঁসাই কোথায়? —

মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেঁহো নহে তুমি আগোয়ান।।
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম।।[৪২]

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা হবেন নির্লিপ্ত ধার্মিক, তাঁদের জীবনযাপনে কোনও আড়ম্বর থাকবে না। সমাজে কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রচার বৈষ্ণবদের কাজ, সে গৃহী বৈষ্ণব হোক বা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব।

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তির মহিমা এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি বিষয়ী ব্যক্তিকেই বৈষয়িক মোহ থেকে নির্লিপ্ত করে দিতে পারতেন। দুটি চরিতগ্রন্থে গৌড়ের রাজা হুসেন শাহ, ও তাঁর দুইজন হিন্দু রাজকর্মচারী সাকর মল্লিক ও দবীর খাসের উল্লেখ রয়েছে। প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী সাকর মল্লিক ও দবীর খাস ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কিনা তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, তবে এঁরা গৌড়রাজের প্রিয় পাত্র ছিলেন। কিন্তু রামকেলীতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এঁরা দুজনেই বিষয়-বিমুখ হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব এদের নাম দিয়েছিলেন সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী। সাংসারিক এবং সম্পত্তির বন্ধন কাটিয়ে শ্রীরূপ বৃন্দাবনের পথে পাড়ি দিয়ে প্রয়াগে চৈতন্যেদেবের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী রাজা হুসেন শাহের কোপানলে পড়ে বন্দী হন। রূপ গোস্বামীর মুদির কাছে রেখে যাওয়ার দশ সহস্র মুদ্রা দিয়ে তিনি কারামুক্ত হন এবং রাতের অন্ধকারে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এই যাত্রাপথেই তাঁকে গাজীপুরে ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত একটা ভোটকম্বল উপহার দিয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহদ্বারে উঠেছিলেন কারণ ঐসময় চৈতন্যদেব সেই গৃহে অবস্থান করছিলেন। সনাতনের বৈষ্ণবোচিত ভাব দেখে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব খুশি হন। সনাতন এক গৃহে প্রত্যহ মাধুকরী ও অঙ্গে নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন না। তিনি সম্পত্তি ভোগ ত্যাগ করলেও মোহ ত্যাগ করতে না পারার জন্য ভোটকম্বল ত্যাগ করেননি। চৈতন্যদেবের দৃষ্টি তাঁর ঐ ভোটকম্বলের উপর তা বুঝতে পেরে সনাতন এক ভিক্ষুককে তা দান করে তার বস্ত্র গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব নির্লিপ্তভাবে বৈষ্ণবধর্ম

পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আদেশে শ্রীরূপ বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন। সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন যা বর্তমানে বৈষ্ণবধর্মের প্রাণস্বরূপ।

চৈতন্য পূর্ববর্তী ভক্তিবাদের পটভূমি

যুগে যুগে মহাপুরুষদের আগমন ঘটেছে ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। *রামায়ণ*, *মহাভারত*-এর সময়কাল যদি ধরি, তাহলে ত্রেতাযুগে রাম অবতারে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে রাবণের পাপাচারের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করেছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে যদুপতি অধর্মের বিনাস করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ত্রেতা, দ্বাপর যুগের হোম যজ্ঞের বিস্তার ছিল। সেই যজ্ঞের মধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটত। যেমন যজ্ঞ থেকেই দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল। আবার রাম-লক্ষণ সহ চার ভাইয়ের জন্মের মূলে ছিল যজ্ঞের হোমকুণ্ড থেকে উঠে আসা পায়েস। ত্রেতা, দ্বাপরে হোমযজ্ঞের গুরুত্ব বিস্তৃতভাবে থাকলেও কলিযুগের এই হোমযজ্ঞের গুরুত্ব কমে যায়। কেবলমাত্র তান্ত্রিকরা তন্ত্রসাধনায় হোমযজ্ঞকে গুরুত্ব দিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবধর্মের পটভূমি সংকীর্ণভাবে তৈরি হয়েছিল। সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যায় এই পটভূমি তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই। ঐ সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃতভাবেই বিষ্ণুর উপাসনা শুরু হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের পটভূমি তিনটি রূপে তৈরি হয়েছিল।

প্রথমত খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় ১৫০০ বছরের ইতিহাস থেকে জানা যায় কৃষ্ণভক্তির উপাসনার প্রারম্ভিক রূপ। যার নিদর্শন বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যেমন *গীতা*, *শ্রীমদ্‌ভাগবত*, *রামচরিতমানস* এছাড়াও দাক্ষিণাত্যে রচিত *ব্রহ্মসংহিতা*, *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* প্রভৃতি। এর পাশাপাশি *বিষ্ণুপুরাণ*, *বায়ুপুরাণ*, *স্কন্দপুরাণ*, *মৎস্যপুরাণ* প্রভৃতি পাওয়া যায়। আরও পিছিয়ে গেলে *উপনিষদ* এমনকি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের ভাগবত ভক্তির প্রতিপাদক উপলব্ধির

বিন্যাস দেখা যায়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে কৃষ্ণের মূল কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন *মহাভারত*-এর মধ্যেই বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।[৪৩]

দ্বিতীয়ত দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভক্তিধর্মের আলোচনার প্রসার ঘটে দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়ে। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ খণ্ডন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে "ব্রহ্মই সত্যবস্তু এবং ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় অপর কোনও সত্য নেই।" ঐ সময় শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ নামে ভক্তিধর্মের প্রচার করেছিলেন, যার মূল কথা ছিল ব্রহ্মই সত্য, নির্বিশেষ, নির্গুণ। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসত্য ভাষ্যের যে ভাবে স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন এবং যেভাবে সৃষ্টি এবং জীবের ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতে ভক্তিভাবুক দার্শনিক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে স্বতন্ত্রভাবে এগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা শঙ্করাচার্যের অভিমত খণ্ডন করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। এইভাবেই রামানুজ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), নিম্বার্ক (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ), মধ্বাচার্য (ভেদাভেদবাদ), বল্লভাচার্য (শুদ্ধাদ্বৈতবাদ) প্রচার করেছিলেন। এই অভিমতগুলির মধ্যে পারস্পরিক নগণ্য কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এই সবগুলি অদ্বৈতবাদ থেকে বিশেষভাবে পৃথক এবং এক্ষেত্রে এগুলি একমুখী। শঙ্করাচার্য এবং তৎসম্প্রদায় অদ্বৈতবাদীদের মতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সৎ, অন্য যা কিছু অসৎ। এই জ্ঞান শুদ্ধ, নির্বিশেষ ও নির্গুণ। রামানুজের মতে জীব ঈশ্বরের চিদংশ। তাই আত্মা অনাদি, অজর , অমর হলেও পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মার আশ্রিত জীব কর্মফলের ভোক্তা এবং কর্মসূত্রে পরিচালত বলে সংসারে আবদ্ধ । শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুচার্যের মতে ঈশ্বর শক্তিমান, শ্রী বা লক্ষ্মী তার শক্তি। লক্ষ্মী বা শ্রী সমন্বিত নারায়ণ বা বাসুদেব হলেন ঈশ্বর। অর্থাৎ, রামানুজাচার্য ছিলেন লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসক। তিনি শ্রী শক্তিকে প্রকাশ করে অভেদের মধ্যে ভেদের সূত্র স্থাপন করে বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামানুজাচার্য একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণবংসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মতে জগত ও ব্রহ্ম সূর্য ও সূর্যরশ্মীর

ন্যায় অভেদে অবস্থিত। তিনি শঙ্করাচার্যের মতবাদকে একেবারে নস্যাত না করে কিছুটা গ্রহণ করেছেন এবং কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দির প্রথমভাগে বৈষ্ণব আচার্য নিম্বাকাচার্যের আবির্ভাব ঘটে দক্ষিণ ভারতের তেলেগু ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর দার্শনিক মতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের দ্বারা জগত ও জীবের সৃষ্টি। ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু একই। নিম্বার্ক সগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসক হলেও পরে রাধা কৃষ্ণকেও প্রাধান্য দিয়েছিল। শনক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম এবং জীবজগত ভেদ এবং অভেদ সম্পর্কে অবস্থিত। তাই ব্রহ্ম কারণ, জীবজগত কার্য, ব্রহ্ম অংশী জীবজগত অংশ, ব্রহ্ম জ্ঞেয় জীবজগৎ জ্ঞাতা, ব্রহ্ম উপাস্য জীব উপাসক। ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা, জীব বহির্যামী ও নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্ম শুদ্ধস্বরুপ কারণ জীব কার্যসূত্রে কারণের প্রকাশরূপে কার্যসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ জীব ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান লাভের অধিকারি হয়। নিম্বার্কের এই মতাদর্শে শঙ্করাচার্যের মতবাদের প্রভাব কম পরিমানে পরেছে। জীবজগৎ ও ব্রহ্মের দ্বৈত স্বত্বা আংশিকভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে নিম্বার্কের সনক সম্প্রদায়ের মতবাদে। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে মধ্বাচার্য বৈষ্ণব দর্শনের তৃতীয় মত প্রচার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে যা ভেদাভেদ মতবাদ নামে অভিহিত হয়ে আছে। মধ্বাচার্যের মতে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং স্বতন্ত্র। মধ্বাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের ঘোর বিরোধী। তিনি তাঁর মতবাদে পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলেছেন। ব্রহ্মে ও জীবে ভেদ, জীবে ও জীবে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ। এমনকি মধ্বাচার্য মুক্ত আত্মার মধ্যেও ভেদ দর্শন করেছিলেন। তার মতে সমস্ত জ্ঞানই ভেদাভেদমূলক। মধ্বাচার্য লক্ষ্মী নারায়নের উপাসক ছিলেন এবং তাঁর প্রচারিত সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় নামে অভিহিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি দর্শনের চতুর্থ মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বল্লভাচার্য প্রচার করেছিলেন। এই মতাদর্শে জীব ও জগত উভয়ই সত্য, মায়া বা মিথ্যার আবরণে আবৃত নয়, উভয়ই ব্রহ্মময়।

বল্লভাচার্যের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ। একদিকে তিনি যেমন মনে করতেন ভক্তিসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি কৃষ্ণের সাক্ষাতলাভ। তিনি অন্যদিকে সগুণ ব্রহ্মবাদ যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমন কৃষ্ণকেন্দ্রিক ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় রূদ্র সম্প্রদায় নামে অভিহিত। শ্রী, রূদ্র, শনক এবং ব্রহ্ম নামক দাক্ষিণাত্যের চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য প্রচারিত ভক্তিবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে প্রভাবিত করেছে। এঁদের প্রত্যেকের মতে ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব।[৪৪]

বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ব্রহ্মভক্ত বৎসল বিষ্ণু। অগ্নি এবং অগ্নির উত্তাপে সূর্য ও সূর্যকিরণের যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সই সম্পর্ক। শনক সম্প্রদায়ের মতে জীব এবং ব্রহ্মের সম্পর্ক সুবর্ণ পিণ্ড এবং সেই পিণ্ড নির্মিত স্বর্ণালঙ্কারের সম্পর্কের মত। নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু হলে অভিন্ন। দ্বাদশ শতাব্দীতে মাধ্যাচার্য ও তাঁর দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রচার করেন। তাঁর মতে হরি, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম এক। রুদ্র সম্প্রদায় বল্লভাচার্যের প্রচারিত ধর্মের ভগবান গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণের দর্শনলাভ ভক্তিসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। এইভাবেই ধাপে ধাপে বৈষ্ণব ধর্মপথ উত্তীর্ণ হয়েই অহৈতুকী ভক্তিধর্মের পথ নির্মিত হয়েছে। মাধবেন্দ্রপুরী বঙ্গে সরাসরি ভক্তিধর্মের প্রচার ঘটিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত এই চারটি ভক্তি সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদের সঙ্গে ভাগবতের আদিরসাশ্রিত উজ্জ্বলরসে বিস্তার ঘটেছে। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ,* বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি প্রমুখ কবির সহায়তার রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকথা নিয়ে নানা সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সকল কাব্যে লোকজীবনের ছবি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। তেমনই ভক্তিভাবকতার বিকাশও স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।[৪৫]

তৃতীয়ত পঞ্চদশ শতকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশের পূর্বে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের পটভূমি তৈরি হয়েছিল। *চৈতন্যভাগবত*-এর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস আচার্য, জগন্নাথ মিশ্র প্রমুখের গৃহে এবং নবদ্বীপের সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম পালন হত। তাঁরা একনিষ্ঠভাবে ভক্তির দ্বারা বিষ্ণুসেবা এবং

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠ করতেন। কারও কারও গৃহে আবার নাম সংকীর্তন করতেন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবমণ্ডলী। মূলত এই নামসংকীর্তনের আসর বসতো লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক শ্রীবাস গৃহে এবং শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতাচার্যের গৃহে। এইভাবে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্মপালন শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রবিরোধী বৈষ্ণব ধর্ম পালনের কেন্দ্রে ছিলেন বৈষ্ণবমণ্ডলীর মাথা অদ্বৈতাচার্য। ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, কেশবভারতীর মতো অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্য *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* পাঠ করে কৃষ্ণভক্তির অনুকূলে তা ব্যাখ্যা করতেন। ভক্তির আবেগে তাঁর দেহে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মানবজীবনে ধর্মীয় গ্লানি অনুধাবন করে তিনি মানসিক পীড়া অনুভব করতেন। তাই কলিযুগে পাপীতাপী ও ধর্মীয় গ্লানি থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি তন্ময় হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকতেন। তিনি চাইতেন কৃষ্ণ নরদেহে অবতীর্ণ হয়ে যাতে কলিযুগকে উদ্ধার করেন। অদ্বৈত আচার্যের মতে ধর্ম বড় নয়, মানুষই বড়। তাই তিনি যবন হরিদাসকে গৃহে স্থান দিয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। অদ্বৈতাচার্যই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন কৃষ্ণভক্তি প্রেমের মধ্য দিয়েই ধর্ম ও কর্মপথে থাকা সম্ভব। মুসলমান হরিদাস ঠাকুর চৈতন্যপূর্ব ভক্তিধর্মের বিশেষ দৃষ্টান্ত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পরেও এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ নররূপে জন্মগ্রহণ করে সাধারণ শিশুর মত জীবনযাপন করলেও কৃষ্ণের মাহাত্ম্যগুণ তাঁর মধ্যে প্রবহমান ছিল। গয়াভ্রমণের আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণবভক্তের সন্তানমাত্র। পাঠশালায় তিনি ব্যাকরণের ভুল ধরে সহপাঠীদের বিরক্ত করতেন, তেমনি ছাত্রদের টোলে শিক্ষাদানের সময় কড়া নজরে রাখতেন। যদি কোনও দিন সন্ধ্যাহ্নিক না করে টোলে কোনো শিষ্য শিক্ষালাভ করতে আসত, তাহলে তাকে টোল থেকে ফিরিয়ে

দিতেন। এইভাবেই পরিবারের সাধারণ মানব হিসেবে সমাজ, সংসারের নিয়ম মানতেন। গয়াভ্রমণের আগে পর্যন্ত মহাপ্রভুর জীবন প্রায় একইভাবে সাংসারিক নিয়মের ধারাবাহিকতায় চললেও গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর সান্নিধ্যলাভ তাঁর জীবনে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তাঁর শরীরে কৃষ্ণভক্তি প্রেমের নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। সাধারণ মানুষ চৈতন্যদেবের এই অবস্থা দেখে তাঁর শারীরিক কোনও ব্যাধি হয়েছে বলে ভাবলেও শ্রীবাস আচার্য তাঁর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবেগ ফুটে উঠেছে তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ভক্তিপ্রেমে আপ্লুত হওয়ার পূর্বে সহপাঠী মুকুন্দ এবং মুরারী গুপ্ত বৈষ্ণব ভক্তিপ্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। মুরারী গুপ্ত রাম উপাসক ছিলেন এবং সাধারণ ভক্তির পথ অনুসরণ করেছিলেন। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পূর্বে রামায়েত সম্প্রদায় এদেশে প্রচলিত ছিল। বিগ্রহ হিসাবে কৃষ্ণের পূজা না করে এই সম্প্রদায় রামের পূজা করতেন। কিন্তু ভক্তিভাবের দিক থেকে এই সম্প্রদায় স্বতন্ত্র ছিল না। কৃষ্ণ এবং রাম উপাসকদের সহজ ভক্তিপদকে নবদ্বীপের ঐশ্বর্যবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সুনজরে দেখতেন না এবং ধর্মসাধনায় নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় অন্য একটি ভক্তিধর্ম সকলের অগোচরে প্রভাবিত ছিল। মাধবেন্দ্রপুরী থেকেই এই ভক্তিপ্রেমের জন্ম। চৈতন্যদেব এই ভক্তিপ্রেমকে ভক্তিরসের আদি সূত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর মধ্যে ভক্তিপ্রেমের সকল ভাব প্রকাশিত হত। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে মেঘদর্শনে কৃষ্ণের বিরহভাবে উদ্দীপিত হয়ে 'কৃষ্ণ' বলে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন পুরী সম্প্রদায়ের ভক্তিভাবক ঈশ্বরপুরী ও পরমানন্দপুরী। এছাড়া তিনি কেশবভারতী, অদ্বৈত আচার্য ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে প্রেম-ভক্তি বিষয়ক মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দের দীক্ষাগুরু না হলেও তিনি তাঁকে প্রেমভক্তি বিষয়ক প্রবল প্রেরণা দিয়েছিলেন। এইভাবে সকল মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে প্রেমভক্তির সহজবিস্তার করেছিলেন। ঈশ্বরপুরীর থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে গয়া

থেকে ফিরে এসে চৈতন্যদেব, শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস প্রমুখ বৈষ্ণবদের সঙ্গে শ্রীবাস গৃহে সংকীর্তনে যোগ দেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

গয়া থেকে ফিরে এসে চৈতন্যদেব প্রায় একবছর মাত্র সংসারজীবন পালন করে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় চৈতন্যদেব চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের (জানুয়ারি, ১৫১০) পর নীলাচলে গিয়ে বাস করলে নিত্যানন্দ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে সেখানে বাস করেছিলেন। চৈতন্যদেবের আদেশে নিত্যানন্দ বাংলায় ফিরে এসেছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সহজ ভাবযুক্ত বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন। অসহায় সমাজের পতিত চণ্ডাল থেকে বিপ্র পর্যন্ত সকলকেই তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে সামাজিক মর্যাদা পেতে সহায়তা করেছিলেন। এইভাবেই বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তি ও ভক্তিরস সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে চৈতন্য পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনায় বিশেষভাবে এই ভক্তিরস ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী সাহিত্য। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, নরহরি সরকার প্রমুখ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। এঁদের পদের মধ্যে উঠে এসেছে পঞ্চরস — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় রাধাভাব বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

উপসংহার

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও সমাজসংস্কারমূলক কাজ বৈষ্ণবধর্মে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম হয়ে উঠেছিল কীর্তনপ্রধান। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ গ্রহণ করার অধিকারী হয়েছিল। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* উভয় গ্রন্থ

আলোচনা করে দেখা যায় চৈতন্যদেবের কাছে ধর্মীয় বিভেদ কখনই বড় ছিল না। তিনি কীর্তনপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং ধর্মীয় ভেদাভেদের কোনও স্থান ছিল না। তাই বহু নির্যাতিত মানুষ ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ করেছিল। এভাবেই চৈতন্যদেব জনসংযোগের মাধ্যমে ধর্মীয় বিভেদের মেলবন্ধন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শাসকশ্রেণির হাত থেকে মুক্তিলাভের পথ দেখিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসধর্ম পালন বা সংসারধর্ম পালন হোক — ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে ধর্মপালন করাই বড় ধর্ম। চৈতন্যদেবের সামাজিক, ধর্মীয় কর্তব্য ও ন্যায়ের পথ ষোড়শ শতকে মানবজাতির মধ্যে চেতনাবোধ জাগিয়েছিল এবং চলার পথের পাথেয় হয়েছিল। ফলে তারা একত্রিত হয়ে সামাজিক কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে জনসংযোগ ঘটিয়ে ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানেও চৈতন্যদেবের আদর্শ বহু মানুষের চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র ::

১ মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ১৮৪।

২ রায়, অনিরুদ্ধ এবং চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত) (২০১২)। *মধ্যযুগের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা : কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি। পৃ. ১৪-১৫।

৩ তদেব। পৃ. ১৬।

৪ গোস্বামী, ননীগোপাল (১৪০৭)। *চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব*। কলকাতা : করুণা প্রকাশনী। পৃ. ১।

৫ রায়, অনিরুদ্ধ এবং চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত) (২০১২)। *মধ্যযুগের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা : কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি। পৃ. ১।

৬ গোস্বামী, ননীগোপাল (১৪০৭)। তদেব। পৃ. ১।

৭ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। বৃন্দাবনদাস বিরচিত *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি। পৃ. ৬।

৮ তদেব। পৃ. ৮৯।

৯ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, অন্ত্যলীলা, তৃতীয় অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৩৫ ।

১০ গিরি, সত্যবতী এবং মজুমদার, সমরেশ (সম্পাদিত) (২০১৩)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা : রত্নাবলী। পৃ. ২২৪।

১১ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, অষ্টম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৭১ ।

১২ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৪০।

১৩ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৯১।

১৪ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, চতুর্দশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৯২।

১৫ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৯২।

১৬ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৩৪।

১৭ *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৩৪।

১৮ *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৩৫।

১৯ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিলীলা, চতুর্থ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৪।

২০ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, চতুর্থ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৫।

২১ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৫।

২২ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৫।

২৩ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৬।

২৪ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৬।

২৫ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৭।

২৬ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৪০।

২৭ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৪০।

২৮ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৪০।

২৯ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ২০২।

৩০ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ২০২।

৩১ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ২০৪ ।

৩২ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ.২০৪ ।

৩৩ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষড়বিংশতি অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২০৮।

৩৪ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৫১।

৩৫ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৫১-৫২ ।

৩৬ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২৬।

৩৭ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৬৬।

৩৮ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৬৭।

৩৯ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, ষষ্ঠ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১৭২।

৪০ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৯২।

৪১ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৯২।

৪২ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছদ। তদেব। পৃ. ৮৬।

৪৩ দাস, ক্ষুদিরাম (২০১৫)। *বৈষ্ণব রসপ্রকাশ*। কলকাতা : দে'জ সংস্করণ। পৃ. ৪১।

৪৪ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (১৯৯৭)। *বৈষ্ণব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা : সোনার তরী। পৃ. ২০-২২।

৪৫ গিরি, সত্যবতী এবং সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) (২০১৩)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : রত্নাবলী। পৃ. ৫৮-৫৯ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রস্থানভূমি রচনায় *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর অবদান

ভূমিকা

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমাজ-সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন সময়ে সাধারণতঃ দেব-দেবীর কাহিনি নিয়ে অলৌকিক কল্পনার ভিত্তিভূমিতে বিচরণ করে আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যগীতি ইত্যাদি সাহিত্য ধারা রচিত হত। ঐ রচনাগুলির মধ্যে সমাজ বাস্তবতার ছবি হয়ত ফুটে উঠত, তবে তা রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাই রচয়িতার দার্শনিক মনের পরিচয়ও ওই চরিত্রগুলির মধ্যে নিহিত থাকত।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাংলা সাহিত্যে তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবন নিয়ে চরিত সাহিত্য নামে সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছিল। ঐ সাহিত্যধারায় প্রথম অতিলৌকিকতা, অলৌকিকতার কল্পনার বাতাবরণের গণ্ডী ভেঙে মানবজীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল আর ঐ সাহিত্যধারায় ফুটে উঠেছিল সমাজবাস্তবতা, ভক্তি নির্মাণের ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্ব অর্থাৎ মনোস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়।

বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছেন চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ রচনার প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃন্দাবনদাস মূলত চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরে ধর্ম ও কর্মজীবন নিয়ে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছেন। নবদ্বীপে সমাজ বাস্তবতা এবং কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ কীভাবে

মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর পরবর্তী চব্বিশ বছরের নীলাচল লীলার কাহিনি *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঐ গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীলাচল, কাশী, বৃন্দাবনের সমাজ বাস্তবতা এবং চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কীভাবে করেছেন, এই চরিত্রগ্রন্থগুলিতে চৈতন্যদেবের মনস্তাত্ত্বিক ভাবের পরিচয় তৎকালীন মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, বর্তমানেও কীভাবে চৈতন্যদেবের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা মানবজাতির চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে, সেই তথ্য খোঁজার চেষ্টা করব এই আলোচনায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রস্থানভূমি

মধ্যযুগে বাংলায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে গুরুত্বময় ঘটনা। কারণ, ঐ সময় হুসেন শাহর মত উদারচেতা নেতা রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন, তা সত্ত্বেও মুলুকপতি, মৌলবী, কাজী প্রমুখ ধর্মযাজক এবং ছোট ছোট অঞ্চলের আঞ্চলিক শাসকরা বাঙালির প্রতি অত্যাচার করতেন। ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে উঠেছিল জাতি। জাতিনাশ, অত্যাচার ও কারাবাসের ভয় থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না। সমাজে জাতিভেদ প্রথার গোঁড়ামি ছিল কঠোর। বর্ণভেদ অনৈক্য ভয়াবহভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিদ্যার ঔদ্ধত্ব, ধনগৌরব, কৌলিন্য প্রথার প্রভাব পড়েছিল জাতির উপর। নীরস ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে পাঠগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার যেমন একদিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে শৈব, বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ধর্মীয় প্রভাব ঐ সময় সমাজে অল্পমাত্রায় হলেও ছিল।

নিম্নবর্ণের হিন্দুরা লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করত আর আচার-আচরণ মানত ভক্তিভরে। বর্ণহিন্দুরা অর্থের অহঙ্কারে শক্তির পূজা করত। ঐ সময় হিন্দু সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম হয়ে গেছিল কোণঠাসা —

কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষ হরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।[১]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ তুলে ধরেছেন। তবে ঐ সময় নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া ইত্যাদি শহরে সমাজের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীবাস, অদ্বৈতাচার্য, জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর মিশ্র, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, যবন হরিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ কৃষ্ণের নামগান, বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবা করতেন। এমনই টালমাটাল পরিস্থিতিতে নবদ্বীপে পঞ্চদশ শতকের শেষপর্যায়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐ সময় সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা নিজেদের অহঙ্কার, ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অসহায়, দরিদ্র মানবজাতির দিকে তাকানোর তাদের কোনো অবসর ছিল না।

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বসে।।
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিঞা কেহ যক্ষপূজা করে।।
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।।[২]

অর্থাৎ সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে যখন ধর্মের নামে অন্যায়-অত্যাচার, আমোদ প্রমোদ চলছিল এবং সমাজে চলছিল পারস্পরিক অনৈক্য, সুলতানি শাসনে জনজীবনে অনিশ্চয়তা এবং বহু সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে সুফীধর্মের উদার ধর্মনীতির ছত্রছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শাসক মুসলমানের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েছিল। এমনই টালমাটাল পরিস্থিতিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গদেশে কৃষ্ণভক্তি প্রেমের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। তার চারিত্রিক গাম্ভীর্য এবং কর্মজীবনের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছিল, যা বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* রচনা ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত কৃষ্ণভক্তি 'প্রেমধর্ম বৈষ্ণবধর্ম' বা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' নামে অভিহিত। এই ধর্ম গ্রহণে সাধারণ মানুষের কোনও কৃচ্ছসাধন করার প্রয়োজন ছিল না। কোনও শাস্ত্রীয় নিয়মের বিধিনিষেধ ছিল না। সহজ সরল পথে এই ধর্ম যে কোনো শ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে জাতিভেদ নেই, ধনী-নির্ধনের পার্থক্য নেই, পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান নেই। ঈশ্বর আরাধনার সহজতম পথের নির্দেশ চৈতন্যদেব দিয়েছিলেন যা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল মানুষের কাছে ছিল গ্রহণযোগ্য। তাঁর এই কলুষমুক্ত ধর্ম পুরোপুরি হিন্দু শাস্ত্রবিরোধী নয়, আবার পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মতও নয়। সেই কারণে এই ধর্ম বাঙালির কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় গোঁড়ামির অনিশ্চয়তাকে দূর করার জন্য তিনি এই ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন যা প্রকৃতপক্ষে জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে এক গভীর দর্শন। চৈতন্যদেবের এই উপলব্ধি প্রবর্তিত ধর্মের পেছনে এক উচ্চদর্শন থাকলেও সাধারণ মানুষ তা বুঝতে না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ সাধারণের জন্য চৈতন্যদেব অতি সাধারণভাবে ধর্মাচরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ঈশ্বরে ভক্তি, নামসংকীর্তন ও জনসেবার মাধ্যমে ধর্মপালন।

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁর কর্মজীবন ভক্তিধর্ম প্রচারে বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহাপ্রভুর কর্মজীবনের মধ্যে দর্শন একাত্ম

হয়েছিল তাই মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রচিত চরিতগ্রন্থগুলির পরতে পরতে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা ফুটে উঠেছে। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি জাতীয় ইতিহাসে কীভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা স্পষ্ট হয় চরিতগ্রন্থগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। *চৈতন্যভাগবত* এবং *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে চৈতন্যদেবের পূর্ণজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবন, সামাজিক কর্তব্য ও কর্মজীবন, কৃষ্ণভক্তিপ্রেম, ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে চৈতন্যদেব ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। আবার তিনিই যোগী, উদারধর্মী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। তাই তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিগূঢ়ভাবে দার্শনিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

ব্যক্তির জীবনী আলোচনায় এত বেশি ভক্তি, উচ্ছ্বাস, আধ্যাত্মিক ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি নিগূঢ় ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দর্শন, কবিত্বের বহিঃপ্রকশ, ধর্মচেতনার প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক সাধনার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে দিব্যোন্মাদ অবস্থার লাভ এমন মহৎ জীবন ও কর্মপদ কম মহাপুরুষের জীবনীতেই পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের ধর্ম ও কর্ম জীবনে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিপুণ ভাবে *চৈতন্যভাগবত* এবং *চৈতন্যচরিতারমৃত* গ্রন্থের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের যে নবপর্যায় শুরু হয়েছিল চৈতন্যদেবের দেখানো কর্মপথের দ্বারা সেই ভক্তিধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তাই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের নবপর্যায়কে 'চৈতন্য রেনেসাঁস' বলা হয়। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের ভক্তিধর্মের প্রধান উৎস ছিল *শ্রীমদ্ভাগবত*। তেমনই চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তিধর্মের প্রধান উৎস ছিল চৈতন্যজীবনী ও তাঁর বাণী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবজীবনে চৈতন্যজীবনালোকের দ্বারা যেমন গঠিত তেমনই সাধারণ বাঙালির বৈষ্ণবভাবনাও চৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি। কারণ তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে যেমন জলপান করেছিলেন, তেমনই গন্ধবণিক-গোয়ালা-তাঁতি প্রভৃতি নিম্নজাতির গৃহে পদার্পণ করেছিলেন, আবার যবন হরিদাসকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনই সকলকে

ভক্তিভরে কৃষ্ণের নাম নেবার মন্ত্র দিয়েছিলেন। এমনকি নিজে সন্ন্যাসজীবনে কৃষ্ণনাম স্মরণ এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ ছাড়া শাস্ত্রপাঠ গ্রহণ করতেন না।[৩]

সার্বভৌমের মানসিক ভাবধারার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের ভূমিকা

চৈতন্যদেব নীলাচলে পণ্ডিত সার্বভৌমের কাছে মূর্খ বিপ্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাৎসল্যভাব জেগেছিল। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে বেদান্ত পাঠদান দিয়ে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেবকে ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলে সার্বভৌম মনে করেছিলেন। সার্বভৌম যখন চৈতন্যদেবকে বেদান্ত পাঠের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তখন মুকুন্দ ও গোপীনাথ আচার্য অসন্তুষ্ট হলেও মহাপ্রভু বেদান্ত পাঠ নিতে রাজী হয়েছিলেন। কারণ সার্বভৌমের সেই ভক্তিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া সার্বভৌম মনে করতেন বেদান্ত শিক্ষা সন্ন্যাসীর বড় ধর্ম —

> বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।
> নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।।
> প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
> সেই ত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ।।[৪]

অর্থাৎ চৈতন্যদেব সার্বভৌম পণ্ডিতের ইচ্ছাকে বাধা না দিয়ে সাতদিন মৌনভাবে বেদান্তপাঠ শুনে সার্বভৌমকে জানিয়েছিলেন তাঁর বেদান্ত পাঠের ব্যাখ্যা অনেক কঠিন যা তিনি কিছুই বোঝেননি। তিনি আরও জানান, বেদান্ত শ্লোকের মুখ্য অর্থ বাদ দিয়ে পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। চৈতন্যদেব নিজের মত করে সহজভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের জ্ঞান দেখে সার্বভৌম মুগ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বর্ণনায় দেখিয়েছেন এইভাবেই চৈতন্যদেব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োগে সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যের অহংকার ভেঙে তাঁকে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত করেছিলেন। জ্ঞানগর্ব থেকে মুক্তিলাভ

করে সার্বভৌম মহাশয় কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেছিলেন — কৃষ্ণদাস কবিরাজ দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করেছেন।

বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এর অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে দেখিয়েছেন আঠারো নালা থেকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সঙ্গীসাথী ছেড়ে একাই জগন্নাথ দর্শনের জন্য যত্রা করেছিলেন। জগন্নাথ দর্শনের পর তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত সার্বভৌমের সেবা এবং পরিকরদের হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা তিনি চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন। চৈতন্যদেব এবং তাঁর পরিকররা এই ঘটনার পর সার্বভৌমের পুত্রের সহায়তায় প্রথম জগন্নাথ দর্শন লাভ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম পণ্ডিতের কাছে কৃষ্ণভক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবোচিত দীনতা বুঝতে না পেরে সার্বভৌম সন্ন্যাসগ্রহণ যে ভণ্ডামি তা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলেন –

সার্বভৌম বলেন কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভালবাসিলাম আমি।।
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব যে কহিল কভু নয়।।
কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সব একখানি করিয়াছি অব্যভারে।।
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে।।
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে।।[৫]

অর্থাৎ সার্বভৌম মহাশয় মনে করতেন সন্ন্যাসগ্রহণ করা মানে অহংকারের প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে করা। আপাতদৃষ্টিতে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও আসলে তিনি সাধারণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হিসেবে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ করে সন্ন্যাসী

হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস সম্পর্কে সার্বভৌমের ভুল ধারণা কৃষ্ণপ্রেমের মাধ্যমে দূর করে তাঁকে পরম ধার্মিক বৈষ্ণবে দীক্ষিত করেছিলেন। এইভাবে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিষ্ঠা করলেও আসলে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে সন্ন্যাসীর অহংকার ও ঐশ্বর্যময় পাণ্ডিত্যের অহংকার ও গৌরবের কোনো স্থান নেই।

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির স্বরূপ

চৈতন্যদেব যে সহজ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ধর্মের প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্ম সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে ছিল। তিনি ছিলেন কৃষ্ণোপাসক। তাঁর সাধনায় রাধাভাব প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টম-নবম শতকে শঙ্করাচার্য বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবা করতে গিয়ে জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে যোগ এবং ভক্তি জ্ঞানলাভের উপায়, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের মতে জ্ঞান ভক্তির উপায়, ভক্তিই লক্ষ্য। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মজ্ঞানবলেই জীব ব্রহ্মে লীন হয় । কিন্তু রামানুজের মতে জ্ঞানের ধ্যান এবং ধ্রুবার স্মৃতি থেকে জন্ম নেয় ভক্তি। ভক্তিতে থাকে ভগবৎ সেবারূপ ক্রিয়া অর্থাৎ তাঁর মতে জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে সেবা এবং সেবকের ভাব ফুটে উঠেছে। রামানুজ সম্প্রদায় 'শ্রী' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। কারণ রামানুজপন্থীরা বিষ্ণুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর যুগলরূপের উপাসনা করতেন। সেই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার বৈষ্ণবরা রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রুক্মিনী, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি যুগল মূর্তির উপাসক ছিলেন। শ্রী সম্প্রদায়ের মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন রূপে মনে হলেও অভিন্ন নয়। কারণ পরমাত্মার গুণ ও স্বরূপ তিনিই ঈশ্বর জীবাত্মা তার দাস। রামানুজের এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। দশম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী, সনক, ব্রহ্ম ও রুদ্র সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন। দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যায়ে (১১৯৯ খ্রি.) দক্ষিণ ভারতে তুলট দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মধ্বাচার্য। তিনি ছিলেন ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। এই সম্প্রদায়ের উদাসীন আচার্যগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ, মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক বসন

পরতেন, কপালে তিলক ধারণ করতেন ও দণ্ড-কমুণ্ডুল ধারণ করতেন। মাথা ও বুকে তপ্ত লোহা দিয়ে শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মের চিহ্ন আঁকতেন। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা বিষ্ণুকে বিশ্বকারণ পরমেশ্বর বলে স্বীকার করতেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্যের মতে ভগবান বিষ্ণু স্বগুণ, তিনি সকল গুণের আধার এবং স্বশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। বল্লভাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'রুদ্র সম্প্রদায়' নামে অভিহিত। রুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা বালগোপালের উপাসক। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে বৈষ্ণবাচার্য নিম্বার্ক সনক সম্প্রদায় নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরা গলায় তুলসীর মালা গ্রহণ করতেন এবং জপ করতেন। এঁদের উপাস্য দেবতা রাধা-কৃষ্ণের যুগল রূপ। এই সম্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্র *শ্রীমদ্ভাগবত*। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা কৃষ্ণে আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করতেন ও তাঁর কৃপাপ্রার্থী হতেন।[৬]

চতুর্দশ শতকের শেষ থেকে মাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। পরমানন্দ পুরী, কেশবভারতী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ঈশ্বরপুরী প্রমুখ বৈষ্ণবধর্ম উপাসকদের সহায়তায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটেছিল। ঐ সময় পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের উপাসকরা নানান বিধিনিষেধ মেনে ধর্মপালন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটালেও চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিধিনিষেধ ছিল না, তেমনি তিনি বিশেষ কোনো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি শেষজীবন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যে সম্প্রদায়গুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা তার পার্ষদগণ গড়ে তুলেছিলেন। চৈতন্যদেব প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মে আপাতভাবে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের কোনো প্রভাব না পড়লেও গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় শ্রী, সনক, ব্রহ্ম, রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে। যেমন চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভক্তগণ নৃত্য, গীতের মাধ্যমে হরিনাম সংকীর্তন করতেন। তুলসীর মালা ধারণ, জপ এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে স্থান পেয়েছিল। দেবগৃহ মার্জ্জন, চৈতন্যদেবের প্রিয় কর্ম ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উৎসব বর্ণনায়

চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের ভূমিকা বর্ণনা করে এই বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। এইভাবে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ।

চৈতন্যপূর্ববর্তী কালে ভারত তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক বিচারের দিক থেকে দেখা যায় সৃষ্টি কী, জীবজগতের স্বরূপ বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের স্বরূপের কীরূপ সম্পর্ক এই বিষয়গুলি সাহিত্যালোচনার দর্শনচিন্তার মূল ভিত্তিভূমি। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ, মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদ বাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধা দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বিষ্ণুর উপাসনার নানা নিদর্শন আমরা পাই পালযুগ, সেনযুগ ও গুপ্তযুগের ইতিহাস থেকে। এরও পূর্বে অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে বিষ্ণু বা নারায়ণ অথবা তার অবতারদের পূজা প্রচলিত ছিল। *পদ্মপুরাণ*-এর বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উপাসক নামে অভিহিত ঋক্‌বেদে, উপনিষদে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। *ভাগবত গীতা*-য় বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণ অভিহিত হয়েছেন। এছাড়া পৌরাণিক সাহিত্যে এবং *বিষ্ণুপুরাণ*-এ কৃষ্ণের ভজন এবং পূজা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মধ্যযুগে বৈষ্ণবীয় দর্শন, চিন্তা, ভজন, পূজা, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।[৭]

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের উপাসক হয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায়, প্রকাশানন্দ প্রমুখের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কথোপকথনের মাধ্যমে বৈষ্ণবদর্শনের মূলতত্ত্ব ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থে রূপ-সনাতনের প্রতি চৈতন্যদেবের উপদেশাবলী শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন তত্ত্বের আলোকে প্রকাশ করেছেন। নৈয়ায়িক সার্বভৌম মহাশয় বেদান্তের পণ্ডিত। তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনা করার শেষে উপলব্ধি করেছিলেন কৃষ্ণভক্তি প্রেমের মাধুর্য এবং ভক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ কৃষ্ণের নামসংকীর্তন।

জ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম ভট্টাচার্য। রাজা প্রতাপরুদ্র এবং ওড়িষ্যাবাসীর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মূলত সার্বভৌম মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগে যাওয়ার পথে একদল দস্যু পাঠানকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন পাঠান দস্যুদের কাছে চৈতন্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। দস্যু পাঠান চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন -

প্রভু আগে কহে এই ঠক পাঁচজন।।
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া।।
প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গিজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যসী মোর কিছু নাহি ধন।।
মৃগী-ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন।।[৮]

চৈতন্যদেবের ঔদার্য ও কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তি পাঠান দস্যুদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

ধর্ম ও দর্শন — এই দুটি বিষয় আলাদা হলেও অনেক সময় বিষয় দুটি কাছাকাছি অবস্থান করে। কারণ ধর্ম ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করলেও অনেকসময় ধর্মের তত্ত্ব, জ্ঞান, যুক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর দর্শন গড়ে ওঠে। তাই কখনো কখনো ধর্ম ও দর্শন একে অপরের সঙ্গে জড়িত থাকে। দর্শনের চরম লক্ষ্য যাই হোক না কেন দর্শনের মূল লক্ষ্য হল জ্ঞান। একজন দার্শনিক জানা বা বোঝার মধ্যে দিয়ে সার্থকতা লাভ করেন কিন্তু ধর্ম অনুভূতিপ্রধান। তার লক্ষ্য বোঝা, জানা নয়। তার লক্ষ্য নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া। জ্ঞানমার্গে দর্শন ও ভাবমার্গে ধর্ম ওতঃপ্রোতভাবে মিলতে পারে তবে এরা কাছাকাছি হলে একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন দর্শনের উপর যদি অনুভূতির ভাব বেশিমাত্রায় প্রভাব ফেলে, তাহলে তত্ত্বের বিকৃতি ঘটে আবার ধর্মের উপর যদি দার্শনিক বুদ্ধি প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে

তখন ধর্মেরও স্বধর্মনাশ ঘটে। সাধারণত সব ধর্ম অনুভূতিপ্রধান। তবে দর্শনের প্রভাবের ফলে কোনো কোনো ধর্ম হয়ে যায় অনুভূতিহীন, আবার কোনো ধর্ম হয় অনুভূতিসর্বস্ব। ভারতবর্ষের ভক্তিবাদ অনুভূতিপ্রাণ। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, তা ছিল মূলত অনুভূতিসর্বস্ব। চৈতন্যদেবের আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি জীবনের শেষ বারো বছর কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হয়েছিলেন, তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন দিব্যোন্মাদ দশায়। সেখানে দর্শনের থেকেও হৃদয়াবেগই গুরুত্বময়।

চৈতন্যদেবের নির্দেশে সনাতন গোস্বামীসহ অন্য পাঁচজন গোস্বামীর সহায়তায় বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্মের উত্থান ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রসের ধর্ম ও প্রেমের ধর্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অশাস্ত্রীয় নয়। যৌবনে নিমাইপণ্ডিত যখন থেকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যদেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তখন থেকেই শাস্ত্র অপেক্ষা প্রেমভক্তি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর ভাবসাধনা ছিল ভক্তিনির্ভর। তাঁর নির্দেশে গড়ে ওঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভাবরসের সঙ্গে দর্শনের ভূমিকা গুরুত্ব লাভ করেছে। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদারতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে রামানন্দের কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা ঐতিহাসিক না হলেও সেই তত্ত্বের গুরুত্ব অসামান্য, কারণ বৈষ্ণবধর্মের উজ্জ্বল রস অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর — এই পঞ্চরস এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দর্শন উঠে এসেছে রায়রামানন্দের কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে।

যথার্থ বিশ্বাস, কল্পনা, ঐশ্বর্যময় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সঠিক আসক্তির ভক্তি পথের সন্ধান দিতে পারে। চৈতন্যদেব নবদ্বীপ লীলায় সেই ভক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। যে ভক্তিপথের সন্ধান চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে থেকে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, জগন্নাথ মিশ্র, শ্রীবাস আচার্য, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব উপাসকরা বিষ্ণুর উপাসনা করে এসেছেন। চৈতন্যদেব ঐ কৃষ্ণভক্তি-প্রেম ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব আন্দোলনের দ্বারা সাধারণ জনজাতির মধ্যে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের অলৌকিক ভাবের সেবা করেন। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রর

যুদ্ধে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রকাশ করেছেন, সেই ভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাদের কাছে অর্জুনের কৃষ্ণের প্রতি সখা ভাবে সাধারণ আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামার পতি জ্ঞানে কৃষ্ণের সঙ্গে সাধারণ আচরণও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বারকা লীলায় কৃষ্ণের অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে গ্রহণযোগ্য। দ্বাপরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উদ্ধব, শ্রীদাম, সুদাম, নন্দ, যশোদা এবং গোপীনিদের সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির মাধুর্য্য লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই কাহিনী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি সাধনার অভিলাষিত বস্তু। একই সঙ্গে নব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজেও এই কাহিনি পাথেয় হয়ে আছে। ষোড়শ শতকে অদ্বৈত, শ্রীবাস, রায়রামানন্দ, চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রমুখ এই কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির প্রচার করেছিলেন সাধারণ জন-জাতির মধ্যে।

বৈষ্ণব রসপ্রস্থানের নির্মাণকৌশল

ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব পদকর্তারা ভক্তিকে রস-রূপে সাধনা করেছেন এবং নানান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় ভক্তিরস নামে নানান বৈচিত্র্যে ভরা একটি অভিনব অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। জাতি-কূল নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেই সম্ভোগ লাভের অধিকারী এই কথা স্মরণে রেখে বৈষ্ণব পদকর্তারা নতুন বিধি নিয়মের প্রবর্তন করছিলেন। ফলে ধর্মাচারনের নতুন পথের সন্ধান বৈষ্ণব নৈয়ায়কগণ পেয়েছিলেন লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রে আলোচ্য রস থেকে। লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নয়টি রসের ব্যাখ্যা সূচিত হয়েছে তার মধ্যে ভক্তির স্থান নেই। অলঙ্কার শাস্ত্র উদ্ভবের পূর্বে অবশ্য উপনিষদের কোথাও কোথাও ব্রহ্মকে রস ও আনন্দের স্বরূপ অভিহিত করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা রসাস্বাদের চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে কিনা তা জানা যায় না। অন্ততঃ শঙ্কর, রামানুজের ব্যাখ্যা থেকে তা পাওয়া যায় না। শিব-পার্বতীর প্রণয়ের কথায় কালিদাস লৌকিক প্রণয় রসের মহিমা বর্ণনা করেছেন। অভিনব গুপ্ত শান্ত

রসকে সমর্থন করেছেন তবে রাগাত্মিকার অনুভব করেননি। সেন রাজবংশের কবি জয়দেব, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, বাংলার বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণে লীলাগীত ভক্তের অন্তরেও রসরূপে সাধিত হয়েছিল ঠিকই তবে প্রাথমিক বিচারে সমাজে তার স্বীকৃতি ছিল না। আলংকারিকেরাধর্মীয় সাহিত্যকে ভিন্ন রাজ্যের বলে স্থান দিয়েছিলেন। প্রকৃত কাব্যের এবং ধর্মের দুস্তর ব্যবধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে লঙ্ঘন হয়েছিল। লৌকিক লীলা এবং ধর্মীয়তা এক হয়ে যায়নি ঠিকই, তবু দুইয়ের সীমা বিস্মৃত হয়েছে। ধর্ম সদর্থক হওয়ায় জনগণের অধিকার বেড়ে গিয়েছে। আলংকারিকেরা শব্দের গুণ-রীতিময় বক্রতা লক্ষ্য করেছিলেন। চৈতন্যদেব হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নামের রসমাধুর্য প্রচার করেছিলেন, ফলে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের প্রকৃতি রসিকদের দ্বারা কাব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় লীলা, যা মূলত অপ্রাকৃত, সুচারুভাবে নির্মিত ফলে অপরিসীম কাব্যরসে পরিণত হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত নবরস হল শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রস। এই রসগুলি সংযোজিত হয় বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারী ভাবের সহায়তায়। এই রসগুলি আটটি স্থায়ীভাবের উপর নির্ভরশীল। স্থায়ী ভাবগুলি হল রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, জুগুপ্সা, ভয়, উৎসাহ ও বিস্ময়। অলংকার শাস্ত্রে উল্লেখিত এই নবরসের মধ্যে লোকায়ত ভাব ফুটে উঠেছে। একইভাবে ফুটে উঠতে সহায়তা করেছে ব্যাভিচারী ভাব এবং সাত্ত্বিক ভাবের প্রকৃতি। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদকর্তারা লোকায়তভাবের সঙ্গে অলৌকিক ভাব যোগ করে উজ্জ্বল রসের ব্যাখ্যা সূচিত করেছেন। কৃষ্ণরতির মধ্যে লৌকিক ভাব এবং অলৌকিকভাব — দুই স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে। লৌকিক প্রেম-স্নেহের মধ্যে কৃষ্ণরতির আকার এবং আভাষ ফুটে উঠলেও স্বরূপ ফুটে ওঠেনি। এই প্রেম কপটময়, জীবের প্রেম স্বার্থময় এবং কৃষ্ণে প্রেম নিঃস্বার্থময় অর্থাৎ শুদ্ধ। জন্ম-জন্মান্তের সাধনা করে সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের চিত্তের মধ্যে কৃষ্ণকথা শ্রবণের প্রবৃত্তি হয় এবং ঐ প্রবৃত্তি যদি ক্রিরষ্ণের প্রতি রুচি, নিষ্ঠা, আসক্তিতে পরিণত হয়, তাহলে লীলা কীর্তন, কৃষ্ণনাম স্বরণ প্রভৃতি সে অনুশীলন করে থাকে, ফলে চিত্ত মসৃণ ও শুদ্ধ

হয়। কৃষ্ণ রতির আবির্ভাব তার চিত্তের মধ্যে ঘটতে পারে। কৃষ্ণ ভক্তির রতি ও রস পরিণাম অচিন্ত্য ভেদাভেদগত। এই রস কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি ও জীবশক্তির ভেদাভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভক্তির ভাব অপ্রাকৃত, অলৌকিক, লৌকিক কাব্যশাস্ত্র ভাবের উপর নির্ভরশীল। আর এই ভাবের সঙ্গে অনুভাবের ও ব্যাভিচারী ভাবের সহায়তায় যে আনন্দাত্মক আস্বাদ সৃষ্টি হয়, তাই অলৌকিক। এই লৌকিক এবং কৃষ্ণরতির অলৌকিক সমার্থক নয়। তাই কাব্যরসের অলৌকিক অপ্রাকৃত নয়। কারণ কাব্যরসের মধ্যে কল্পনার বাতাবরণ থাকলেওবাস্তব অবস্থার প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে। সেই কারণে ব্যক্তির রসাস্বাদনের অবস্থাকে বুঝতে গেলে লৌকিক ভাবে বোঝার দরকার। আর এই লৌকিক ভাব বোঝার জন্য অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সত্ত্বা একমাত্র প্রমাণ। তাই লৌকিক আর বৈষ্ণবদের অলৌকিক — দুই-ই মানবজগতের নয় আধ্যাত্মিক। শব্দদুটি এক হলেও মূল অর্থ আলাদা। বৈষ্ণব ভক্তি রতি থেকে রস পরিণাম এবং তার কারণ-কার্য সমান। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব সবই অপ্রাকৃত বলে পরিগণিত হয়েছে। বৈষ্ণব আলংকারিকেরা ভাবের রস পরিণামের মৌলিক সূত্র যদিও মেনে নিয়েছেন এবং ভাবসাধনার আস্বাদকে রসাবস্থান বলে ধরে নিয়েছেন, তবু বিশেষ ক্ষেত্রে তারা প্রচলিত রসশাস্ত্রের বৈচিত্রগুলি মেনে নেননি। পৃথক অর্থ অবলম্বন করেছেন এবং স্থানে স্থানে উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছে।[৯]

শৃঙ্গার রস

অলঙ্কার শাস্ত্রে নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার রস, শৃঙ্গার রতি নামে স্থায়ীভাবে থেকে উদ্ভূত ও উজ্জ্বল রসাত্মক যথা পৃথিবীতে যে কিছু শুভ্র, উজ্জ্বল, পবিত্র তা শৃঙ্গারে স্থান পায় এই শৃঙ্গার রস স্ত্রী-পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং উত্তম যুবা পুরুষের প্রকৃতি সম্পন্ন। শৃঙ্গার রস দুটি ভাগে বিভক্ত — ১) সম্ভোগ, ২) বিপ্রলব্ধ। নয়টি রসের মধ্যে শৃঙ্গার, রীতু, অনুলেপন ও অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত। প্রিয়জন সঙ্গ ও অতিসুন্দর গৃহের উপভোগ, প্রমথ উদ্যানে গমন, অনুভূতি, শ্রবণ,

দরসন প্রভৃতি লীলার দ্বারা শৃঙ্গার ভাব উৎপন্ন হয়। নেত্র চাতুর্য্য, কটাক্ষ, সুন্দর গতি, মধুর বাক্যে অনুভাব দ্বারা শৃঙ্গার রসে অভিনয় প্রযোজ্য হয়। নানান ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারা এই ভাবের রস সম্পন্ন হয়। আনন্দ, স্পন্দন, হাস্য, কম্পন, নিদ্রা ইত্যাদি।[১০]

শৃঙ্গার রস বৈষ্ণব পদকর্তাদের সহায়তায় বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। এই রস মধুর রস নামে অভিহিত হয়েছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বল বা মধুর রসের আখ্যা দিয়েছেন। উজ্জ্বল শব্দটি শৃঙ্গারের ভর প্রদত্ত বিশেষণ থেকে নেওয়া। শৃঙ্গারের দুই বিভাগ সম্ভোগ অর্থাৎ মিলন এবং বিপ্রলব্ধ অর্থাৎ বিচ্ছেদ। সম্ভোগ শৃঙ্গারকে শ্রীরূপ প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করেছে। মুখ্য সম্ভোগ হল পরিস্ফূট, জাগ্রত এবং সচেতন অবস্থা। গৌণ সম্ভোগ হল এক অদ্ভুত, বিচিত্র স্বপ্নাবস্থান। এই স্বপ্নাবস্থান লৌকিকের মত নয়। অলৌকিক, অপ্রাকৃত ভাবাবস্থান। মুখ্য এবং গৌণ সম্ভোগ প্রত্যেকটি চার ভাগে বিভক্ত — সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। প্রচলিত অলংকার শাস্ত্র থেকে মধুর রস এখানে আলাদা। প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রে বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার চারটি পর্যায়ে বিভক্তি। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। শ্রীরূপ গোস্বামী এগুলির মধ্যে করুণকে বাদ দিয়ে প্রেম-বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। করুণে নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজন মৃত হন। তবে চিরতরে মৃত্যু বর্ণনা অলংকার শাস্ত্রে না থাকায় পুনর্জন্ম দেখানো হয়। তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনায় এই ধরনের মৃত্যু বর্ণনা অসম্ভব দেখে সেই সঙ্গে পরকীয়া প্রীতির অনিবার্য বাস্তব অবস্থার বিষয় উপলব্ধি করে রূপ গোস্বামী করুণের পরিবর্তে নতুন পর্যায়ে প্রেম বৈচিত্র্য নির্ধারণ করেছিলেন। সম্ভোগ শৃঙ্গার মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর। ১) মুখ্যসম্ভোগ ও ২) গৌণসম্ভোগ। সম্ভোগ শৃঙ্গার হল নায়ক-নায়িকার সুখ তাৎপর্যময় দর্শন আলিঙ্গণ চুম্বনাদিযুক্ত মিলিতাবস্থা। এর মধ্যে মুখ্য সম্ভোগ হল নায়ক-নায়িকা পরস্পর জাগ্রত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি নিয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থা। মুখ্য সম্ভোগ চার ভাগে বিভক্ত —

ক) সংক্ষিপ্ত — পূর্বরাগের শেষে নায়ক-নায়িকা লজ্জা ও সম্ভ্রমের বাধার ফলে চকিত চুম্বনালিঙ্গণ পর্যন্ত যে ব্যাপার, তাই সংক্ষিপ্ত।

খ) সংকীর্ণ — নায়কের পূর্বকৃত উপেক্ষা বা প্রবঞ্চনার পর যে মিলন, এতে চুম্বন, আলিঙ্গণের মাধুর্যের সঙ্গে বঞ্চনার স্মৃতি জড়িত থাকে। ফলে এই মিলন বাধাহীন পূর্ণ মিলন হয় না।

গ) সম্পন্ন — অদূর প্রবাসের পর ব্যাকুল অবস্থায় পরস্পরেরর যে মিলন তা হল সম্পন্ন। প্রেম বৈচিত্র্যের পর বা ভাবী ও ভবন বিরহের পর মুহূর্তে যদি মিলন হয়ে যায় তবে তাও সম্পন্নের অন্তর্গত হবে। তাছাড়া বিরহ অবস্থায় ভাবাবেশের মিলনও সম্পন্নের অন্তর্গত হবে।

ঘ) সমৃদ্ধিমান—পরাধীনতার জন্য নায়ক অথবা নায়িকাকে দূর প্রবাসে কালযাপন করতে হয়, সেই অবস্থায় সুদুর্লভ মিলন হল সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের অন্তর্গত। এই মিলন প্রবাস থেকে ফিরেও হতে পারে, আবার প্রবাসে থাকাকালীন মানস সাক্ষাৎকারেও হতে পারে। এই মিলনে যেমন প্রেমের রমণীয়তা ফুটে ওঠে, তেমনই শৃঙ্গারের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়।

অধর সুধারসে লুবধক মানসে
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখঅবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ।।[১১]

চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রমুখের পাশাপাশি চৈতন্য সমসাময়িক এবং পরবর্তী বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রূপ গোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রমুখ পদাবলী কর্তারা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে শৃঙ্গার রসের এই ভাবগুলি নানান পদে ফুটিয়ে তুলেছেন। গৌণসম্ভোগ — স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষভাবে সম্মিলনই হল গৌণসম্ভোগ। বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ নবদ্বীপ লীলা বরণনায় যশোদা

বাৎসল্যভাব ফুটিয়ে তোলার সময় এই ভাবের বর্ণনা করেছেন। নবদ্বীপ থেকে শচীদেবী নীলাচলে থাকা পুত্র নিমাইয়ের সাক্ষাৎ পেতেন কারণ চৈতন্যদেব মাতা শচীকে এমনই আশ্বাসবাণী দিয়েছিলেন। গৌণো সম্ভোগও সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান — এই চার ভাগে বিভক্ত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ স্বপ্নযোগে মিলনকে সত্য বলে মানেন কারণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকার মত ভক্ত বৈষ্ণবগণও কল্পনায় ইষ্টদেবতার সাক্ষাতে ইচ্ছাপূরণ করতে পারেন।

চিরদিনে মীলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ হুতাশ।।
বাম পানি দেই দখিণ ধারে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে।।[১২]

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার — সম্ভোগের পুষ্টিকারক এই বিপ্রলম্ভে পূর্বে মিলিত অথবা অ-মিলিত নায়ক-নায়িকার অভীপ্সিত মিলন না পাওয়ার মনোভাব বিশ্লেষিত হয়েছে। বিচ্ছেদই মিলনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। পূর্বরাগ, মান, প্রেম্বৈচিত্র্য এবং প্রবাস — বিপ্রলম্ভের এই মুখ্য চার ভেদ।

১) পূর্বরাগ — প্রকৃত মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার মিলন ইচ্ছায় যে রতি তাকে বলে পুর্বরাগ। দর্শন প্রত্যক্ষ হতে পারে আবার ছবি অথবা স্বপ্ন থেকেও এই রাগ হতে পারে। শ্রবণ থেকেও এই রাগ জন্মাতে পারে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গয়া থেকে ফেরার পথে নাটশালা গ্রামে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন, *চৈতন্যভাগবত*-এ এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রভু বোলে কানাঞির নাটশালা গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান।।
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর।।
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগন লখিতে না পারি।।
হাতেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর।।[১৩]

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো।[১৪]

২) মান — নায়ক-নায়কা পরস্পর অনুরক্ত এবং নিকটে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যে মানসিক অবস্থা উভয়ের মিলনে বাধা জন্মায় তা-ই হল মান। প্রণয় না থাকলে মানের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। নির্বেদ, শঙ্কা, গর্ব প্রভৃতি ।

শুনহ রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি।।
মিছাই করিলি মান।
তো বিনু আকুল কান।।
অনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলি হরি।।
উলটি করিস মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান।।[১৫]

মান দুই প্রকারের হয়। সহেতু ও নির্হেতু। তেমন প্রবাসও মূলত দুই প্রকার — অদূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস।

৩) প্রবাস — কৃষ্ণের চকিত অন্তর্ধানে রাধার বিরহ অবস্থা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-কার ও পদাবলীকারদের পদে ফুটে উঠেছে। গোষ্ঠযাত্রা, কালীয়দমন ইত্যাদি অদূর প্রবাসের অন্তর্গত। প্রচলিত পদাবলীর আক্ষেপানুরাগ পর্যায় পরকীয়া রতিতে মিলনের সাধারণ বাধা প্রতিবন্ধকের উপর ভিত্তি করে বিরচিত বলে এটি অদূর প্রবাসের অন্তর্ভূক্ত। দূর প্রবাসের বিরহাবস্থাকে তিনভাবে বিভক্ত করে দেখা যায় — ভাবী বিরহ, ভবন বিরহ এবং ভূত বিরহ। এই বিন্যাস পূর্বপ্রচলিত অলংকার শাস্ত্রেও দেখা যায় —

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি

সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা।।
সখি হে অব মোহে নিষ্ঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই।।
কো জানে চাঁদ চকোরিনি বঞ্চব।
মাধবি মধুপ সুজান।।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহিন নিরমাণ।।
পাপ পরাণ আন নাহি জানত।।
কানু কানু করি ঝূর
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর।।[১৬]

৪) প্রেমবৈচিত্র্য — নায়ক-নায়িকা পরস্পর সমীপবর্তী হলেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ স্বাভাবিক বিচ্ছেদকাতরতাময় যে আর্তি তাই হল প্রেমবৈচিত্র্য। গোপীপ্রেমে বিশেষতঃ মহাভাবময় রাধাপ্রেমে এই ভাবের স্ফূর্তি আরও বিশেষভাবে হয়ে থাকে।

শ্যামক কোরে যতনে ধনি শূতল।
মদন আলমে দুহুঁ ভোর।।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গণ।
জনু কাঞ্চন মণি জোড়।।
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহিঁ মঝু মীটব
অমিয়া করব সিনান।।[১৭]

এই শৃঙ্গার রস বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে এবং কৃষ্ণ রতির প্রেমমাধুর্য্যকে প্রভাবিত করে মধুর রস নামে অভিহিত হয়েছে।

বৈষ্ণদর্শনে পঞ্চরসের অভিনবত্ব

কৃষ্ণভক্তি-প্রেমের উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণব সাহিত্যে যে ভক্তিরসের সৃষ্টি হয়েছে তা 'পঞ্চরস' নামে অভিহিত হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর — এই পঞ্চরসগুলি সংগঠিত হয় প্রচলিত অলঙ্কার শাস্ত্রে রসের ব্যাখ্যা অনুসারে। যেমন ভরতাচার্য্যের মতে —

বিভাবানুভাব্যভিচারিসংযোগদ্রস্নিষ্পত্তিঃ।[১৮]

বিভাব হল নায়ক-নায়িকার চিত্তবৃত্তির কারণ। বিভাবের দুটি ভাব — ১) আলম্বন বিভাব, ২) উদ্দীপন বিভাব। যাকে আশ্রয় করে নায়ক-নায়িকার মধ্যে চিত্তের জাগরণ ঘটে তাই হল আলম্বন বিভাব। যেমন দুষ্মন্তের রতির আলম্বন বিভাব শকুন্তলা। উদ্দীপন বিভাব অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে যা সহায়তা করে। যেমন বসন্তকাল, নৃত্য, গীত আর অনুভাব হল নায়ক-নায়িকার বাহ্যিক শারীরিক বিক্রিয়াসমূহ। আর ব্যাভিচারীভাব হল নায়ক-নায়িকার অস্থায়ী ভাব, অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ব্যাভিচারীভাবের সংযোগে যেমন প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রে রস সংগঠিত হয় তেমনই বৈষ্ণব রসসাস্ত্রে এই পঞ্চরস এই ত্রিবিধ ভাবের দ্বারাই সংগঠিত হয় এবং প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রের নবম রসের মতই এই পঞ্চরসগুলি স্থায়ীভাবের দ্বারা নির্ভর ও পরস্পরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। শান্তরসের স্থায়ীভাব 'সম' বা 'নির্বেদ'। দাস্যরসের স্থায়ী ভাব দাস্য ভাব বা প্রীত ভাব। সখ্য রসের স্থায়ীভাব সখ্য বা প্রেম। বাৎসল্য রসের স্থায়ীভাব বাৎসল্য ভাব। মধুর রসের স্থায়ীভাব মধুর ভাব।

শান্ত রস — বিষয়ে বিরক্ত যোগীদের পরমাত্মা-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে সমতা বর্জিত যে ভাব সম্বন্ধ, তাই শান্ত রতির পোষক। তারা এই ভাব আশ্রয় করে ব্রহ্মানন্দের সুখ অনুভব করে থাকে এই রসের সাধক সাধারণতঃ ঋষিরাই হয়। এই রসের আলম্বন বিভাব হল পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণের চিন্দানন্দময় রূপ। উদ্দীপন বিভাব হল ভক্তের সাহচর্য্য লাভ। বেদ, উপনিষদ, শ্রবণ, অনুভাব হল মৌণ অবলম্বন। সঞ্চারী ভাব হল ধৈর্য্য, স্মৃতি। সাত্ত্বিক ভাব হল নির্বেদ, রোমাঞ্চ,

কম্পন ইত্যাদি। বিষয়বিমুখ মোহ মুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মধ্যে শান্ত রসের এই সমস্ত ভাবই বর্তমান থাকে। কৃষ্ণকে সর্বঐশ্বর্যশালী নিত্যবস্তু রূপে জেনে ভক্তগণ বিষয়ভাবনা ত্যাগ করে একান্ত নিষ্ঠায় তাঁর চরণে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করেন। এক্ষেত্রে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোনও নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাকে না। আরাধ্য দেবতারূপে তাঁরা ভগবানের সেবা করেন।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত। ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাত্তত সাগর লহরী সমানে।।[১৯]

বিদ্যাপতির এই পদে শান্তরসের ভাব ফুটে উঠেছে।

দাস্যরস — ভক্ত যখন আরাধ্য দেবতার দাস হিসেবে নিজেকে সেবার কাজে নিয়োজিত করেন তখন ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক হয় সেব্য-সেবক। দাস্য অর্থাৎ প্রীত ভক্তির দুটি রূপ সম্ভ্রমপ্রীত এবং গৌরবপ্রীত। সম্ভ্রম প্রীতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল আজ্ঞাপালন, বিশ্বাস এবং নম্র বুদ্ধির পরিচয় প্রদান। সম্ভ্রম প্রীতের মূল ভাব বৈশিষ্ট্যগুলি হল কম্পন এবং সম্ভ্রম। আলম্বন বিভাব হল পরিচর্যা গ্রহণে মনোভাব প্রকাশ করা। দ্বাপরে কৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাব প্রদান করেছিলেন উদ্ধব। সাত্যকি, বিদুর এবং শরণাগত কালীয় নাগ প্রভৃতি। কলিযুগে আবির্ভূত চৈতন্যদেবের প্রতি মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ প্রমুখ সম্ভ্রম প্রীতি প্রকাশ করেছিলেন দাস-রূপে সেবার মাধ্যমে। উদ্দীপন বিভাব হল কৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ লাভ, অনুগ্রহ লাভ ও চরণধূলি গ্রহণ। অনুভাব হল যুক্ত করে আজ্ঞা পালন। গৌরবপ্রীত হল নিচাসনে বসা এবং বন্ধুত্ব প্রদান। দাস্যরসে ব্যভিচারীভাব হল হরষ, গর্ব, দৈন্য স্মৃতি, শঙ্কা প্রভৃতি। সাত্ত্বিক ভাব হল স্তম্ভ, স্বেদ, দাস্যভাবের মধ্যে শান্তভাবের নিষ্ঠা কৃষ্ণের সেবায় পরিপূর্ণ থাকে।

ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
প্রহরেক সেহোমতে আছে বিশ্বম্ভর ।।
ক্ষণে ধ্যানে করে কর মুরলীর ছন্দ ।
সাক্ষাতে দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ।।
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন ।

দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন ।।
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে ।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে।।"[২০]

সখ্য রস — যাঁরা যাত্রা ভাবে কৃষ্ণতুল্য এবং কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববোধ থাকে অতুলনীয় তারাই কৃষ্ণের সখা। দ্বাপরে যেমন সুদাম, শ্রীদাম, অর্জুন, দ্রৌপদী প্রমুখ কৃষ্ণের সখা ছিলেন, তেমনই কলিতে চৈতন্যদেবের সখা ভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রায়রামানন্দ, মুকুন্দ, স্বরূপ দামোদর, গদাধর পণ্ডিত প্রমুখ। সখ্যভাবের মধ্যে শান্তের নিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবাভাব পুরোপুরিভাবে নিহিত থাকে। সখ্যরসের উদ্দীপন বিভাব হল রেণু, শৃঙ্গার, পরিহাস, নানান ধরনের খেলা ইত্যাদি। অনুভাব হল বাহুযুদ্ধ, যষ্ঠিক্রীড়া, জলক্রীড়া, দ্যূত ইত্যাদি। ব্যভিচারী ভাব হল উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য বাদে ত্রিশটি।

সাত্ত্বিক ভাব — স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি। একত্রে শয়ন, উপবেশন, পরিহাস ইত্যাদি সখ্যভাবের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কারণ দ্বাপরে কৃষ্ণ যেমন তাঁর সখাদের সঙ্গে একত্রে শয়ন বা উপবেশন করতেন, তেমনি কলিযুগে চৈতন্যদেব তাঁর সখাদের নিয়ে কৃষ্ণের তত্ত্ব কথা যেমন আলোচনা করতেন, তেমনই অদ্বৈত, শ্রীবাসগৃহে হরিনাম সংকীর্তন, নৃত্য-গীত করতেন। আবার সখাদের সঙ্গে একত্রে ভোজনও করতেন। স্বরূপ দামোদর এবং গদাধর পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সখা যাঁরা চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ দশায় সর্বত্রই সঙ্গে থাকতেন। সখ্যভাব মূলত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের সখাদের লীলাকাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ধূলায়ে ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখিল কালির বিন্দু শোভে মনোহর।।
পড়িয়া শুনিয়া সব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলয়ে সবে রঙ্গে।
মজিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।

শিশুগণ সঙ্গে করে জল পেলাপেলি।।[২১]

বাৎসল্যরস — পুত্রজ্ঞানে হীনভাবে স্নেহরস প্রদান করাই হল বাৎসল্যরতি বা বাৎসল্য ভাব। বিভাব ও অনুভাবের মিলনে বাৎসল্যরসের পরিণাম লাভ করে। বাৎসল্য রসে নিষ্ঠা, সেবা, মিলন থাকলেও বাৎসল্যরসের মূল আধার হল স্নেহ-মমতা। যশোদা, শচী প্রমুখ বাৎসল্য ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন পুত্র স্নেহের মাধ্যমে। তাছাড়া তাড়ন, ভর্ৎসনা, বন্ধন ইত্যাদি আচরণগুলি মাতা শিশুসন্তানকে শাসন করতে গিয়ে করে থাকেন। এর ফলে মাতার স্নেহ-মমতার মহিমা প্রকাশ লাভ করে। বাৎসল্য রসের আলম্বন বিভাব হল দ্বাপরে কৃষ্ণ, তথা কলিতে আবির্ভূত চৈতন্যদেবের গুরুজনরা। যেমন – শচীদেবী, জগন্নাথ মিশ্র, মালিনী দেবী, শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য, সার্বভৌম মহাশয় প্রমুখ। উদ্দীপন বিভাব হল বাল্যচাপল্য, বাল্যক্রীড়া, অনুভাব হল লালন, প্রতিপালন, উপদেশ দান, মস্তকাঘ্রাণ প্রভৃতি। সাত্বিক ভাব হল স্তম্ভ, স্বেদ। ব্যভিচারী ভাব হল দৈন্য, স্মৃতি, শঙ্কা, হর্ষ, আবেগ, লজ্জা প্রভৃতি চব্বিশটি। বাৎসল্য রসের রতি উৎকর্ষ লাভ করে প্রেম, স্নেহ থেকে অনুরাগ পর্যন্ত অর্থাৎ সন্তান স্নেহের গভীরতা আরও স্পষ্ট হয় মাতা-পুত্রের মান-অভিমানের দ্বারা।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছি কোথা।।
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি রাধা বহে না পারে রাখিতে।।"[২২]

মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব

লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রস রতি, আদি বা শৃঙ্গার রস নামে অভিহিত বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে সেই রসই উজ্জ্বল বা মধুর রস নামে অভিহিত হয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের এই রতি বা শৃঙ্গার নায়ক-নায়িকার প্রেমভাব — বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে মধুর রসের পরিণাম লাভ করে। এই মধুর রতির মূল আধার হলেন কৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ। প্রেয়সীদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠা হলেন রাধা। মধুর রসের উদ্দীপন বিভাব হল কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, রাধার রূপ-গুণ, যমুনার তট প্রভৃতি। ব্যভিচারী ভাব হল আনন্দ, কম্পন, স্তম্ভ, হাস্য, ক্রন্দন প্রভৃতি। অনুভাব হল কটাক্ষ, বিক্ষেপ ইত্যাদি। সাত্ত্বিক ভাব হল স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি। মধুর ভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবের সমস্ত গুণই বর্তমান থাকে। এছাড়া মূল বিষয় হল প্রেমের একাত্ম বন্ধন। এই বন্ধনের ফলে মধুর রতি উৎকর্ষতা লাভ করে এবং এই রতি প্রেম, স্নেহ থেকে মহাভাব পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে। এই মহাভাবে একমাত্র শ্রীরাধাই পৌঁছতে পেরেছিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জনি।।"[২৩]

চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাধাপ্রেমের সেই উপলব্ধি আস্বাদন করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সেই মহিমা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এছাড়া সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দেওয়া ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে মধুর রতির চরিত বিস্মৃতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রচলিত পঞ্চরস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের মধ্যে মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে।[২৪]

বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখিত পঞ্চরসের মধ্যে মধুর রস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। কারণ এই দুই সম্প্রদায়ই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মহিমাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যদিও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মহিমাকে বাস্তবে স্থান দেননি, অলৌকিক প্রেম মাহাত্ম্যরূপে ভক্তি ভরে তাঁরা সম্মান করতেন। সহজিয়া বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষনের প্রণয় মহিমাকে বাস্তবে স্থান দিয়েছিলেন। তাই সহজিয়াদের কাছে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। সহজিয়া বৈষ্ণব উপাসকদের মূল আধার ছিল

জপ, তপ, নাম, গান ও দেহতত্ত্বের সাধনা। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে ছিল সহজিয়া বৈষ্ণবদের মূল আস্থা। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য সহজিয়ারা দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিতে গিয়ে বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন লাভ করেছিলেন এবং ঈশ্বরপুরীর সাহচর্য্য লাভ করেছিলেন। ফলে জ্ঞানী এবং সুপণ্ডিত বিশ্বম্ভরের তেইশ বছর বয়সেই অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। গয়া থেকে ফেরার পর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। শুদ্ধ ভক্তি-প্রেমের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য উপলভদির ইচ্ছা তাঁর ঐ সময় থেকেই ঘটেছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর পরবর্তী চব্বিশ বছর চৈতন্যদেবের কাছে তাই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি বড় হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যেমন ভূমিকা লাভ করেছিল, তেমনই চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণবধর্ম থেকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সহজিয়া বৈষ্ণবরা ভক্তিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

নবদ্বীপে যে গৌর-নাগর তত্ত্ব বা গৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা বর্ণিত হয়েছে ঐ লীলাকাহিনিতে শাস্ত্রের ভূমিকা সেইভাবে পড়েনি। ভক্তি এবং বিশ্বাসের দ্বারা গৌরাঙ্গের লীলাকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই লীলা কাহিনির মধ্যে নানান অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটা থাকায় গৌরাঙ্গ দেবতারূপে স্থান লাভ করেছেন নদীয়ার বৈষ্ণবদের কাছে। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সাথী। চৈতন্যদেব নীলাচলে আসার পর নিত্যানন্দ নদীয়া তথা সমগ্র বাংলায় সহজ সরলভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। নিত্যানন্দ বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচার করেছিলেন, তাই গৌর-নিতাইয়ের লীলাকাহিনি বিস্মৃতভাবে নদীয়ায় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিস্তার লাভ করেছিল। বহু বৈষ্ণব পদকর্তারা চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার রাধাভাবকে কেন্দ্র করে গৌরাঙ্গ বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছেন। যা বৈষ্ণব উপাসকরা কীর্তন করে গৌরাঙ্গের সাধনা করেন।

পতিত হেরি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন পড়ি যায়।।
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি।।[২৫]

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের পদাবলীতে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার মহিমা বর্ণিত হয়েছে যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব উপাসকদের সাধনায় চৈতন্যদেবের মহিমা বর্ণনা করতে সহায়তা করেছে নামগানের মাধ্যমে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা জপ, তপ, নামগানের সঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের সাধনায় দেহতত্ত্বের কোনও স্থান ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূল আধার ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড় ছিল। চৈতন্যদেব রূপ-সনাতন সহ বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবই রূপ গোস্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষ্ণের মহিমা যাতে ব্রজধামে সীমাবদ্ধ থাকে। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনঃস্তাত্ত্বিক ভাবধারায় উজ্জ্বল রসের মহিমা এবং রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের মহিমা বর্ণিত করেছেন রূপ গোস্বামীসহ ছয় গোস্বামীর সাহচর্য্যে এসে। তেমনই নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন। গৌর-নিতাইয়ের লীলাকাহিনি নদীয়া লীলা বর্ণনার মাধ্যমে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মধুর রস ছাড়া আরও চারটি রস — শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের প্রাধান্য দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব সহ স্ব-পার্ষদের লীলাকাহিনির বর্ণনার মাধ্যমে বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ সেই রসের প্রাধান্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চৈতন্যদেব শুধু রাধাভাবে ভাবিত হয়েছিলেন তাই নয় — দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবেও ভাবিত হয়েছিলেন। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চৈতন্যদেবের মধ্যে এই ভাবগুলি দেখা দিয়েছিল বৃন্দাবনদাস এমন ঈঙ্গিত দিয়েছেন *চৈতন্যভাগবত*-এর পরতে পরতে।

যেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন নির্ভর।

পৃথিবী হয়েন খণ্ড সভে পায় ডর।।
সে কোমল শরীর আছাড় ঘন দেখি।
গোবিন্দ স্মরয়ে আই ঝুরে দুই আঁখি।।[২৬]

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস পূর্ববর্তী নাম গৌরচন্দ্র। তিনি ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাঁর সোনার মত উজ্জ্বল দেহের রঙ রাধার দেহের রঙের অনুরূপ ছিল। তিনি বাহিরে রাধাভাবে ভাবিত ছিলেন। চৈতন্যদেবকে রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণের স্বরূপ বলা হলেও আসলে তিনি প্রেমিক সাধক রূপে রাধার প্রেমের উপলব্ধি করতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তগণ গৌরচন্দ্রের রাধভাবে ভাবিত দিব্যোন্মাদের নানান অবস্থা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন নীলাচল লীলার শেষ বারো বৎসরে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ভক্ত পরিকরদের মধ্যে কীর্তনগায়ক মুকুন্দ চৈতন্যদেবের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে ভাবের অনুরূপ কীর্তন গেয়ে শুনাতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর অন্তঃলীলার পরতে পরতে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রভুর অঙ্গর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে।[২৭]

গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ প্রেমভক্তির মহিমা গ্রহণ করে বহু বৈষ্ণব ভক্ত পরিকর গৌরাঙ্গের তিরোভাবের পর গৌরাঙ্গ বিষয়ক নানান পদ রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত ঐ পদগুলি চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে তাঁরা গৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা এবং নীলাচল লীলার নানান কাহিনি নিয়ে গৌরাঙ্গ বিষয়ক নানান পদ রচনা করেছিলেন যা বৈষ্ণব পদাবলীতে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী নামে অভিহিত হয়েছে।

কৃষ্ণের লীলাকাহিনির সঙ্গে গৌরাঙ্গের লীলাকাহিনি সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বৈষ্ণব সাধকগণ কীর্তন আকারে কৃষ্ণের পদ গাওয়ার আগে প্রাথমিক ভাবে গৌরাঙ্গের পদ গেয়ে শুরু করেন। বৈষ্ণব সাধকগণের গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমেই স্পষ্টভাবে দিক নিরূপিত হয় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, চৈতন্যদেবের নীলাচল লীলা অথবা নদীয়া লীলার কাহিনি গাওয়া হবে।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবের পদ প্রচুর থাকলেও গৌরাঙ্গ বিষয়ক মধুর ভাবের পদ পাওয়া যায় না, তবে মাথুর ভাবে গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ পাওয়া যায়, যেখানে গোরা শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণের মিলিত রূপ নয়, ব্রজগোপীর ভূমিকায় নদীয়া নাগরীগণ —

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি নেল।।[২৮]

এক্ষেত্রে এই রুস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, নায়ক গৌরকৃষ্ণ, নায়িকা নদীয়া-নাগরী। এখানে গৌরাঙ্গ ভাবাবেশে রাধার বেদনাময়ী মূর্তির উপলব্ধি করছেন।[২৯]

গৌরাঙ্গবিষয়ক সমস্ত পদ গৌরচন্দ্রিকা না হলেও যে সমস্ত পদের মধ্য দিয়ে গৌরাঙ্গের দেহকান্তি মানসিক অবস্থা এবং নদীয়া নাগরীদের ব্যাকুল অবস্থা ফুটে উঠেছে তাই গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ, বাসুঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বহু গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ রচনা করছেন।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।।
তো সবারে কে আরে করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে।।[৩০]

এই পদটিতে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে যাওয়ার বর্ণনা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলে বৃন্দাবনবাসী বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক তেমনই গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচল যাত্রা করলে নদীয়াবাসী গৌরাঙ্গের বেদনায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন। এমনই ভাবে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীতে গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ এবং নদীয়াবাসীর বিরহাবস্থা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

রাধাতত্ত্ব-কৃষ্ণতত্ত্ব

দ্বাদশ শতক থেকে সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে রাধাতত্ত্ব উঠে এসেছে। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ রাধা-কৃষ্ণের লীলা ও রাধাতত্ত্বের স্পষ্ট ভাব দেখা যায়। ঐ সময় থেকে বৈষ্ণব ভক্তগণ রাধা-কৃষ্ণের লীলা আস্বাদনই পরম পাওয়া বলে মনে করতেন। মধুর রসের ঘণীভূত বিগ্রহ রাধার এই রূপ বৈষ্ণব সাহিত্যেই প্রথম ফুটে উঠেছে। মূলত রাধার আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা মধুর রসকে আশ্রয় করেই সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য জুড়ে স্থান লাভ করেছে।

মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাতত্ত্বের প্রধান দুটি লক্ষণ লীলাবাদ ও মধুর রসের প্রাধান্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ বর্ণিত রাসলীলা, জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনি মধুর রস আস্বাদিত। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বর্ণিত রাধাতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রচারিত রাধাতত্ত্বের আলোচনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্বের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে উপাস্যরূপে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের পূর্বে প্রসিদ্ধ চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় — শ্রী, সনক, রৌদ্র, ব্রহ্ম এদের মধ্যে নিম্বার্কদের দ্বারা গড়ে ওঠা সম্প্রদায় সনক সম্প্রদায় নামে অভিহিত। শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানুজের পরবর্তী ছিলেন নিম্বার্ক। নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হলেও বাস করতেন বৃন্দাবনে। সেই কারণে লক্ষ্মী, শ্রী প্রভৃতির পরিবর্তে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কাছে রাধা প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিম্বার্ক পরম ব্রহ্ম হলে গ্রহণ করেছেন।[৩১]

রাধাতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ষোড়শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আলোচনায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলতে শুধু গৌড়দেশের বৈষ্ণবদের বোঝানো হয়নি। গৌরীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী বৈষ্ণবদেরকে বোঝানো হয়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী বৈষ্ণবদেরকে বোঝায়। চৈতন্যদেব প্রথম দক্ষিণভারতে গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরের রাজকর্মচভারী রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই

তত্ত্বের আলোচনা করেছেন মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের বক্তা চৈতন্যদেব। মনে করা যেতে পারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব দাক্ষিণাত্য থেকে উঠে এসেছে চৈতন্যদেব দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময় ঐ অঞ্চল থেকে লীলা সুকের *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন এমন ইঙ্গিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব নিজেই নীলাচলের ভক্ত পরিকর এবং গৌড় দেশের ভক্ত পরিকরদের হাতে *কৃষ্ণকর্ণামৃত* তুলে দিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের রাধাভাবের যে বর্ণনা *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ আমরা পাই, তা মাধুর্যময়। এই গ্রন্থে বর্ণিত চৈতন্যদেবের দিব্যভাব এবং ভাবাবেশের বিকাশ ঘটেছিল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় চৈতন্যদেব বহু দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাই চৈতন্যদেবের রাধাভাবে রায়রামানন্দ সহ দক্ষিণ ভারতীয় বহু বৈষ্ণবের প্রভাবে থাকা সম্ভব।

রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেব যে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব ও সাধ্বসাধন তত্ত্বের কথা আলোচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই তত্ত্ব স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। স্বরূপ দামোদর ছিলেন চৈতন্যদেবের স্ব-পার্ষদ। তাই চৈতন্যদেবের সঙ্গে রায় রামানন্দের কী কথা হয়েছিল তা স্বরূপ দামোদরের পক্ষে জানা সম্ভব বলে মনে করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

> দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে।
> রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে।।[৩২]

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাধ্বসাধনতত্ত্বের বিস্মৃত বর্ণনা করেছেন। লোকসমাজের মোটামুটিভাবে যতরকম সাধনপন্থা প্রচলিত আছে এই আলোচনায় রায় রামানন্দ প্রায় সবই তুলে ধরেছেন। এই সাধন পন্থাগুলির মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মাদি কতকগুলি সাধনের লক্ষ্য কেবল দৈহিক দুঃখ নিবৃত্তি আর কৃচ্ছ সাধনের লক্ষ্যে কৃষ্ণ সেবা। এই সবকিছুর

আলোচনার মাধ্যমে রায়রামানন্দ দেখিয়েছেন কৃষ্ণসেবাতেই জীবের পরম পুরুষার্থ লাভ সম্ভব। কৃষ্ণের নিত্য পরিকরদের সেবার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন রাধার সর্বাতিশায়ী প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের যে সেবা তাই সাধ্যশিরোমণি। চৈতন্যদেবের ইচ্ছাতেই রায়রামানন্দ এই কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিলাস মাহাত্ম্যের চরমতম বিকাশ এবং সেই প্রেম মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন।[৩৩]

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার স্বরূপ হ্লাদিনী হল প্রেম আর প্রেমের মূল আধার মাদনাখ্য-মহাভাব। রাধিকা এই মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিনী। তিনি মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি, প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কৃষ্ণের প্রতিবিধানই রাধার একমাত্র কাজ। তাই রাধিকা কৃষ্ণের কান্তা ভাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।।[৩৪]

পূর্ণশক্তি রাধা, আর কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত। অভেদরূপে রাধা এবং কৃষ্ণ একই স্বরূপ। কেবল লীলারস আস্বাদনের জন্য তারা যুগে যুগে দুই স্বরূপে বিরাজমান। হ্লাদিনীর মূর্তবিগ্রহরূপে পৃথিক ভাবে রাধা-কৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।।[৩৫]

রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক হলেও লীলারস আস্বাদনের জন্য রাধার মধ্যেই প্রেমের সমস্তরকম গুণ পরিপূর্ণ। তাই রাধার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের স্বরূপে মাদনাখ্য-মহাভাবের গুণাবলীর পূর্ণরূপ নেই। উভয়ে এক। তাই কৃষ্ণ যেমন

অখণ্ড রসস্বরূপ, রাধা তেমন অখণ্ড রসবল্লভা। কৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান, রাধাও তেমন শক্তি স্বরূপা, মূল কান্তাশক্তি।[৩৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব নানান দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়ণ করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যেমন রাধা-কৃষ্ণের একত্রে সাধনার বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনই ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর মহাপ্রভু এবং রাধা ভক্তবৈষ্ণবের তত্ত্ব আলোচনায় এবং সাহিত্য রূপায়নে বহু স্থানে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকেই দেহে ও মনে পুরোপুরি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন এমন ইঙ্গিত *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় সকল আচরণই প্রেম উন্মাদিনী রাধাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আপাতভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বর্ণনায় চৈতন্যদেবের এই ভাবই ফুটে উঠেছে।

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর।।
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।।
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু থাকে রাত্রিদিনে।।
রাত্র্যে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি।।[৩৭]

এইভাবে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের নতুন রূপ চৈতন্য চরিত্র বর্ণনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের প্রতিচ্ছবির মধ্যে শ্রীরাধার বিরহ অবস্থায় প্রেম উন্মাদিনী ভাব স্পষ্ট। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব প্রথম রাধাভাবে ভাবিত হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন।

প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গে।
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ।।

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সংবরিলা।।[৩৮]

এই বর্ণনার মাধ্যমে চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশের ভাব ফুটে উঠেছে। একইভাবে চণ্ডীদাস—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি।
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে ।
হেন মনে পরিহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআ বঞ্চে বৃন্দাবনে ।।[৩৯]

এইভাবেই চৈতন্যদেব এবং রাধা এক হয়ে মিলে গিয়েছেন পদাবলী সাহিত্যে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ চৈতন্য-পূর্ববর্তী সমসাময়িক এবং পরবর্তী বহু বৈষ্ণবকবির রচিত পদে রাধা-কৃষ্ণের বিরহাবস্থার নানান ভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যা চৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থার ভাবকেও ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলায়া যায় ও মধুর বোলে।।
নীলমণি-হেন গা মুকুতা-খিচনি।
আই আই মরি যাঙ রূপের নিছনি।।
কালা পাটে গলে দোলে কাঁঠিতে প্রবাল।
শ্যামল তমালে শোভে নবগুঞ্জামাল।।
নাসা-হুলে লোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভাণু সুতা।।[৪০]

এইভাবে চৈতন্য-পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের পদে বিরহ কাতরা রাধার ভাব যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে চৈতন্যদেবের ভাবাবস্থা ফুটে উটেহছে। একইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণববক্তগণ মনে করেন চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার। দ্বাপরে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনে নাগরলীলা করেছিলেন। কলিতে কৃষ্ণই চৈতন্যদেবরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি তাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নদীয়া-নাগর

রূপে অভিহিত করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব অন্তরে কৃষ্ণ বহিরঙ্গে রাধা ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। দ্বাপরে রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-উন্মাদিনী ভাব অনুভব করার জন্য। চৈতন্যদেব মূলত বোঝার চেষ্টা করেছিলেন রাধাপ্রেমের মহিমা কীরূপ ছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রমের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের যে অদ্ভুত মাধুর্য লাভ করেছিলেন, তা কেমন ছিল। কৃষ্ণকে অনুভব করে রাধার সুখের মাধুর্য কেমন ছিল। রাধার এই প্রেমের আস্বাদন উপলব্ধি করার জন্যই একই দেহে রাধা-কৃষ্ণের ভাব ধারণ করে চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৪১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় মহিমা আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। রাধাপ্রেমের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন —

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরানী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তশিরোমণি।।
জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী।।[৪২]

রাধাকৃষ্ণের প্রেম মহিমা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে রূপগোস্বামীর রতি প্রেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই রতি মূলত তিনপ্রকার। ক) সাধারণী, খ) সামঞ্জস্য ও গ) সামর্থ্য রতি।

ক) সাধারণী — যে রতির প্রেম গাঢ় হয় না কৃষ্ণদর্শনের দ্বারা রতি উৎপন্ন হয়ে বেওং যা সম্ভোগ ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে তাই সাধারণী রতি। কুব্জার প্রেম হল সাধারণী রতি কারণ কুব্জা কৃষ্ণকে আনন্দ দিতে নয়, আত্মকাম সম্ভোগ পূরণ করে আনন্দ লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কারণ, কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়েই কুব্জার কাম-মোহ জেগেছিল। তাই সাধারণী প্রেম প্রণয় মহিমাতেই সীমাবদ্ধ। এই প্রেমে মান-অভিমান নেই।

খ) সামঞ্জস্য — সামঞ্জস্য রতি হল পত্নীভাবের অভিমান। পতি এবং পত্নীর মধ্যে সম্ভোগতৃষ্ণা যেমন থাকে, তেমনই কখনও কখনও ঐ প্রেমে মান অভিমান ও থাকে তবে

সামঞ্জস্য রতিতে সম্ভোগ তৃষ্ণা পতি-পত্নী উভয়ই থাকে। রুক্মিণী, সত্যভামার কৃষ্ণের প্রতি রতি হল সামঞ্জস্য রতি। এই রতি প্রেমে অনুরাগ জন্মায়, তবে ভাব সৃষ্টি হয়।

গ) সামর্থ্যরতি — সমঞ্জস্য রতিতে মাঝে মাঝে নিজের সুখেরর সম্ভাবনা থাকলেও সমর্থ্যা রতিতে নিজের সুখের সম্ভাবনা থাকে না। এই রতি সাধারণী এবং সামঞ্জস্যা থেকে বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে কারণ এই রতি উৎপন্ন হলে কূল, ধর্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা সবেরই বিস্মরণ ঘটে। এই রতিতে স্ব-সম্ভোগ ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। কৃষ্ণের সুখসাধন করাই এই রতির একমাত্র ধর্ম।

অতেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য প্রেম হয় মহাবল।।[৪৩]

অর্থাৎ, আত্মকাম সমর্থ্যা রতিতে বড় নয়। কৃষ্ণপ্রেমই সমর্থ্যা রতির শ্রেষ্ঠ গুণ। কামের মাধ্যমে নিজের সম্ভোগ ইচ্ছা প্রকাশ হয় কিন্তু এই সম্ভোগ মোহের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রেমের মাধ্যমে কৃষ্ণকে সুখ লাভ প্রদান করাই সমর্থ্যা রতির বড় গুণ। এই রতি ক্রমে দৃঢ় হয়। আত্মকাম বড় নয়, কৃষ্ণপ্রেমই বড় হয়। ফলে প্রেমিকা প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ-অনুরাগ, ভাব দশায় পৌঁছতে পারে এবং ক্রমে প্রৌঢ় অবস্থায় পৌঁছে মহাভাব দশায় উত্তীর্ণ হয়। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধাই একমাত্র এই মহাভাব দশায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তাই রাধাপ্রেমই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।।
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড যার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর।।
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাঢ়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ।।
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর।।

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হল পঞ্চরস।
যেই রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ।।[৪৪]

এইভাবে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব মহিমা কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪৫]

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রচারে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই সৎ নয়। কেবল ব্রহ্ম যখন আছেন আর কিছুই যখন নেই, তখন সম্পর্কের প্রশ্নটা তত্ত্বগতভাবে অবান্তর। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম, জ্ঞান এবং আত্মা অভিন্ন। কোথাও কোনো ভেদের চিহ্নমাত্র নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব বা জগৎ কিছুই সৎ নয়। সবই অলীক। শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় ছাড় প্রধান বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি সবই ভক্তিবাদী। ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে ভক্তের একটা স্থান আছে। ভক্ত অলীক হতে পারে না। জীব এবং জগৎ মিথ্যা হতে পারে না। প্রধান বৈদিক সম্প্রদায়গুলি শ্রী, সনক, ব্রহ্ম, রুদ্র সম্প্রদায়ের দর্শনে জীব ও জগতে অন্ততঃ আংশিক সত্যাতা স্বীকৃত হয়েছে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বে এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়সহ শ্রী, সনক, ব্রহ্ম, রুদ্র পাঁচটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে জীব ও জগতের সত্ত্বার প্রকার নিয়ে এবং জীব বা ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতে সম্পর্কের প্রকার নিয়ে ঐ পাঁচটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর মতভেদ তৈরি হয়েছিল। তবে জীব ও জগতে সত্যতা নিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। এই সম্প্রদায়গুলির বৈষ্ণবদের মত চৈতন্যদেবের নির্দেশে ষড়গোস্বামীর সহায়তায় বৃন্দাবনে গড়ে ওঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরাও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে স্বীকার করেননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে জীব এবং জগৎ নশ্বর কিন্তু মিথ্যা নয়। এরা ব্রহ্ম থেকে জীব ও জগতে ভিন্নতা স্বীকার করেন। কিন্তু মধ্বসম্প্রদায় যে রকম আত্মকেন্দ্রিক, ভেদবাদী, নিত্য ভিন্নবাদী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তা নয়। তারা

ভেদকে মানে আবার অভেদকেও মানে। অন্যদিকে চৈতন্যসম্প্রদায়ের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি। শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই অকল্পনীয় সম্পর্কের নামই অচিন্ত্যভেদাভেদ।[৪৬]

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে এসে সন্ন্যাসজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি প্রথম ছয়বছর সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে ভক্তিরস আস্বাদন করেছিলেন এবং জীবের মঙ্গলের জন্য তা বিতরণ করেছিলেন। কারো কারো কাছে চৈতন্যদেব নিজ মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে আর কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে তিনই কৃষ্ণভক্তি রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। নির্দেশ দিয়েছিলেন বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও রাধাকৃষ্ণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন চৈতন্যদেব বিষয়ী রূপসনাতনকে কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পুরোপুরি বিষয়বিমুখ করে তুলেছিলেন। এইভাবেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেবের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার প্রকাশ উঠে এসেছে।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময় কোনো কোনো ভক্তের কাছ থেকে আবার কৃষ্ণকথা শুনেছেন। যেমন রায় রামানন্দের কাছ থেকে কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব সম্পর্কে তত্ত্ব শ্রবণ করেছেন। চৈতন্যদেবের কাশীতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ঐতিহাসিকের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সূচিত করেছে কারণ ষোড়শ শতকে কাশীতে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী প্রায় ছিলেন না। তাঁর আদেশে ঐ সময় চন্দ্রশেখর আচার্য এবং তপন মিশ্র নামে দুই গৃহীবৈষ্ণব পরিবার কাশীতে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। কাশীর অবৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা ছিলেন বৈদান্তিক। তাঁরা শিষ্যদের বেদান্তশিক্ষা দিতেন। কাশীর অবৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্রকাশানন্দ। তিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণকারী বৈষ্ণবদের সহ্য করতেন না, তাঁদের ভণ্ড বলতেন। চৈতন্যদেব কাশীতে গিয়ে রাগানুগা ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখকে সাধ্যসাধন তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা এবং নামসংকীর্তনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি ও নামসংকীর্তন শুনে অবৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা অবজ্ঞা, পরিহাস ও নিন্দা করেছিলেন।

কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সহায়তায় প্রকাশানন্দসহ কাশীর বৈদিক সন্ন্যাসীগণ চৈতন্যদেবের দর্শন লাভ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের প্রতি গুরুজনোচিত ভক্তি ও আন্তরিক বৈষ্ণবোচিত দীনতা দেখে প্রকাশানন্দসহ সকল অবৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা অভিভূত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন –

প্রকাশানন্দের প্রভুর ধরিল চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর বন্দিল চরণ।।
প্রভু কহে তুমি জগদ্‌গুরু প্রিয়তম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম।।
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম।। [৪৭]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা এবং সহজ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রচারের রীতিকে নিখুঁত ভাবে সন্তর্পণে *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর পরতে পরতে তুলে ধরেছেন।

বৈষ্ণবদের আচরণে, চিন্তায়-ভাবনায় রাগানুগা ভক্তিভাব প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তগণ পর ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমভক্তবৎসল, পরম করুণ, রসিক শেখর বলে মনে করেছেন। কিন্তু ভক্তিশূন্য জ্ঞানমার্গের উপাসক সন্ন্যাসীগণ পর ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্বিশেষ আনন্দ সত্তামাত্র মনে করেছেন। সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ পণ্ডিত সেই সময়ে অদ্বৈতসাধক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। কাশীতেই তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিল। পুরীতে ছিলেন সার্বভৌম পণ্ডিত, দক্ষিণ ভারতে ছিলেন শ্রীরঙ্গপুরী ও স্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী। এঁরা ছিলেন অদ্বৈতাবাদী। ষোড়শ শতকে এই অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ সকলেই চৈতন্যদেবের যুক্তিতে কৃষ্ণভক্তিতে অনুপ্রণিত হয়ে রাগানুগা ভক্তিমার্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে জানার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করেছিল।[৪৮] চৈতন্যদেব ভক্তিভাবে এই সন্ন্যাসীদের কাছে যেমন নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তেমনই সাধারণ মানুষের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বাংলা, উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সহজভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ

প্রকাশানন্দ সহ বৈদিক সন্ন্যাসীরা চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ প্রভাব ও মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ষোড়শ শতকের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থ এবং ক্ষমতার দম্ভ প্রভাব ফেলেছিল। চৈতন্যদেব সেই অহঙ্কারকে ভেঙে দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে তাঁর নির্দেশপ্রাপ্ত বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথদাস (১৪৯৮-১৫৮৬)[৪৯] ছিলেন জমিদার সন্তান। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণবোচিত দীনতা রঘুনাথদাসকে অনুপ্রাণিত করেছিল। হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস রাজৈশ্বর্যের মধ্যে শৈশবে মানুষ হলেও সম্পত্তির প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তিনি অল্পবয়স থেকে পরমধার্মিক ছিলেন। সাংসারিক বন্ধন তাঁকে কোনো ভাবে বাঁধতে পারেনি। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে রঘুনাথদাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবোচিত দীনতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শৈশবে রঘুনাথদাস চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েও গৃহে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আতিথ্য নিয়েছিলেন, সেইসময় রঘুনাথদাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গৃহত্যাগের সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথদাসকে গৃহত্যাগে বাধা দিয়েছিলেন অনাসক্তভাবে যথাযথ বিষয়ভোগের মাধ্যমে বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা প্রকাশের আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সংসারে থেকে বৈষ্ণবধর্ম পালন করা বড় ধর্ম।

> "স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
> ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।
> মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
> যথযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।
> অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।"[৫০]

অর্থাৎ চৈতন্যদেব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন রঘুনাথদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কিন্তু শৈশবে তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় সাংসারিক মোহ এবং সম্পত্তির প্রতি আসক্তি আছে কিনা। তা উপলব্ধি করতে হলে তাঁর সাংসারিক বন্ধনে অনাসক্ত ভাবে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত বিষয় ভোগ করা উচিত। তাই চৈতন্যদেব রঘুনাথদাসকে ঘরে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। রঘুনাথদাস চৈতন্যদেবের কথামতো অনাসক্তভাবে সাংসারিক কর্তব্য এবং সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। তিনি অন্দরমহলের বিলাসব্যাসন ত্যাগ করে অতি সাধারণ ভাবে বাইরের মহলে বাস করতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে অন্তরে বৈরাগী হয়ে গিয়েছিলেন রঘুনাথদাস। নিত্যানন্দের আদেশে তিনি পানিহাটিতে চিঁড়া মহোৎসব করেছিলেন। রঘুনাথদাস রাতের অন্ধকারে পাহারাদের নজর এড়িয়ে নীলাচলের পথে রওনা দিয়ে বারোদিনের পদব্রজে যাত্রাকালে মাত্র তিনদিন আহারগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এইভাবে জমিদার হয়েও দৈন্যভাবে কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ একদিকে যেমন রঘুনাথদাসের কঠোর নির্লোভ জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের সঙ্গে কঠোরভাবে নিষ্ঠাভরে বৈষ্ণবধর্মের উপাসক হয়েছেন সেই প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছেন। রঘুনাথদাসের বুদ্ধির পরিচয়ের মধ্যেও মনঃস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। সপ্তগ্রামের জমিদার অন্যায়ভাবে যবন মুলুকপতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ায় মুলুকপতি রঘুনাথদাসকে বন্দী করেছিলেন —

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়।।
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ করয়ে সর্ব্বথাই।।
কভু কলহ কভু প্রীতি নিশ্চয়তা নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হৈবে এক ঠাঁই।।
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।

আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক।।
পালক হঞা পাল্যের তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়।।[৫১]

অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন রঘুনাথদাস বুদ্ধি দিয়ে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেমন পাষণ্ড উজীরের মনে জয় করেছলেন, তেমনই নিরপেক্ষভাবে ধর্মপালন এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে জীবনযাপনের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। এইভাবে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের পরতে পরতে দার্শনিক তত্ত্বের নির্মাণ হয়েছে।

নীলাচলে পদার্পণের পর রঘুনাথদাস অন্তরে ও বাহিরে পুরোপুরি বৈরাগী হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করলেও পরে তাঁর যা জুটত তাই তিনি জীবনধারণের জন্য গ্রহণ করতেন। পিতা গোবর্ধনদাসের পাঠানো অর্থ এবং লোক দুইই তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সকল রকমের কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে কৃষ্ণলাভের প্রয়াস করেছিলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথদাসের এই কৃচ্ছসাধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে আদেশ করেছিলেন —

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ কৃষ্ণ সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।[৫২]

অর্থাৎ বৈরাগীর কোনো পিছুটান থাকে না। কৃষ্ণসেবায় ধনী-নির্ধনের কোনো বিভেদ নেই। নিষ্কামভাবে কৃষ্ণসেবা করাই বড় ধর্ম। বিষয়ী হোক আর নির্ধন — সন্ন্যাসগ্রহণ, কৃষ্ণসেবার মাধ্যমে পুনর্জীবন লাভ সম্ভব। বৈষ্ণবোচিত দীনতা আর কৃষ্ণপ্রেমই হল তাঁর প্রধান সম্পদ।

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন, সেই ধর্মের উপাসকরা ছিলেন গৃহী এবং সন্ন্যাসী বৈষ্ণব। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে বৈষ্ণবধর্মের উপাসক হতেন ঠিকই তবে সন্ন্যাসী বৈষ্ণবদের পূর্বজীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকত না। সন্ন্যাসীদের সুন্দরী কামিনীদের প্রতি দুর্বলতা অথবা কোনো বিধবার সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ অধর্ম। বৈষ্ণবোচিত

দীনতার সঙ্গে কঠোর নিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ন্যাসধর্ম পালন করা বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কর্তব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিয়েছেন কীভাবে স্ব-পার্ষদ স্বরূপ দামোদর নীলাচলে বিধবা ব্রাহ্মণীর সন্তানের প্রতি চৈতন্যদেবের স্নেহের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন —

কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা।।
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাহাঁ গোঁসাঙির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি।।
এবে গোসাঞির গুণ সব লোক গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে।।[৫৩]

স্বরূপ দামোদরের নিরপেক্ষ ভাবে স্পষ্ট বক্তব্যে চৈতন্যদেব খুশি হয়েছিলেন। এইভাবেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর হৃদয় হবে নিষ্কলুষ, সাংসারিক মোহ ও অপত্য স্নেহের কোনো ছাপ সে হৃদয়ে থাকবে না। এই দার্শনিক তত্ত্ব পরবর্তীকালে বহু সন্ন্যাসীর জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়েছে।

চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্মে প্রকৃতি সম্ভাষণ ছিল বৈষ্ণবধর্মের নিয়মভঙ্গ। কীর্তনীয়া ছোট হরিদাস চৈতন্যদেবকে ভালো চালের অন্নগ্রহণ করানোর জন্য শিখি মাইতির বোন সধবাদেবীর কাছ থেকে চাল এনেছিলেন। কীর্তনীয়া ছোটো হরিদাসের এই অপরাধের জন্য চৈতন্যদেব মুখদর্শন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বরূপ দামোদরসহ অন্যান্য পার্ষদদের অনুরোধেও তিনি হরিদাসের মুখদর্শন করেননি। বরং পার্ষদদের তিনি বলেছিলেন —

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতা না পারি আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।[৫৪]

চৈতন্যদেব ধর্মপালনে কঠোর ছিলেন এবং পার্ষদদেরকেও সেই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তাই কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের ব্যবহার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে।

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের উদারধর্মনীতির অবদান

ষোড়শ শতকে চৈতন্যসমকালীন বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহ ছিলেন উদারচেতা। তাঁর রাজসভায় বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিল। তিনি সাধারণতঃ হিন্দুদের ধর্মনাশ করতেন না। তবে শাসনব্যবস্থা রক্ষা করার স্বার্থে হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ ও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য না থাকলে চৈতন্যদেব এত সহজে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করতে পারতেন না। সেইসময় উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও জগন্নাথসেবক প্রতাপরুদ্র। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলা রাজা হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রায়ই যুদ্ধ হত। ঐ যুদ্ধের ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। রামকেলী গ্রামে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবোচিত দীনতা, ধর্মপ্রচার করার ক্ষমতা এবং কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি দেখে হুসেন শাহের দুই উচ্চ পদস্থ কর্মচারী বিষয়ী রূপ-সনাতন অর্থাৎ শাকর মল্লিক এবং দবির খাস মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বিধর্মী শাসকের অধীন কর্মজীবন ত্যাগ করে রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে মুক্তির পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। রূপ-সনাতন সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রাজার অগোচরে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যলাভের জন্য গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী রাতের অন্ধকারে বৃন্দাবনের পথে ভাই অনুপমকে নিয়ে যাত্রা করলেও সনাতন গোস্বামী সুলতান হুসেন শাহের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন বাদশার প্রিয়পাত্র। তাই সনাতন তাঁর অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। তবে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সনাতনকে রাজা হুসেন শাহ সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাজী

হননি। কারণ উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের বাস, তাছাড়া তিনি বাদশার অনুপস্থিতিতে মুক্তিলাভের পথ খোঁজার চেষ্টা করতে পারবেন —

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে।।
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা নাশিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে।।[৫৫]

হুসেন শাহ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। তিনি সহজে কোনো কর্মচারীকে মুক্তি দিতেন না। তাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে কর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই সনাতনের কর্ম ছেড়ে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হয়ে জীবনযাপনের সিদ্ধান্তকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

বৃন্দাবনদাস তাঁর রচনায় বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ করলেও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনই তাঁর প্রতিবাদী সত্তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি *চৈতন্যভাগবত*-এর স্থানে স্থানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি কাজী, মুলুকপতির অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন। কিন্তু গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহ ধর্মবিরোধীদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেননি। তিনি শাসনকার্য রক্ষার স্বার্থে হিন্দুরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উড়িষ্যার দেউল মন্দির ভেঙেছেন — এটা তাঁর ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করে গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য পথচলা শুরু করেছিলেন। চৈতন্যদেব গৌড়ের কাছে রামকেলী গ্রামে কিছুদিন গোপনে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণনামের মাধুর্য সকলকে মোহিত করায় তিনি নিজেকে আর গোপন রাখতে পারেননি। তিনি রামকেলিসহ সমগ্র গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। হুসেন শাহ এই সন্ন্যাসীর নাম এবং জনপ্রিয়তা কোটালের মুখ থেকে শুনেছিলেন এবং সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যাতে তাঁর ধর্মকার্যের কেউ বাধা না দেয় —

রাজা বলে এই মুঞি বলিয়ে সবারে।

কেহ জানি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুক সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।[৫৬]

উদারচেতা হুসেন শাহের শাসনকার্যে ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। রাষ্ট্রের শাসনকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের সীমানারক্ষা ও সীমানাবৃদ্ধির স্বার্থে হুসেন শাহ মন্দির-দেউল ধ্বংস করেছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর মানবিকতাবোধ লোপ পায়নি। এই তথ্যই বৃন্দাবন দাস *চৈতন্যভাগবত*-এ তুলে ধরেছেন।

চৈতন্যদেবের নীলাচলে বাসকালে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে সন্ন্যাসীর ধর্মপালন এবং লোকশিক্ষার স্বার্থে রাজদর্শন করতে রাজি হননি। কারণ, রাজদর্শন এবং স্ত্রীদর্শন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর পক্ষে সমান অপরাধ। চৈতন্যদেব দক্ষিণভারত ভ্রমণ সেরে নীলাচলে ফিরে আসার পর রাজপণ্ডিত সার্বভৌম রাজার ব্যাকুলতার কথা জানিয়ে রাজসাক্ষাতের আবেদন করেছিলেন। এতে চৈতন্যদেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে দ্বিতীয়বার এই আবেদন করলে তিনি নীলাচল ছেড়ে আলালনাথে চলে যাবেন —

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।।
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন।।
সন্ন্যসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম হয় বিষের ভক্ষণ।।
সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রজা কিন্তু ভক্তোত্তম।।
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।

কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।।
ঐছে বাত পুনরপি সুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে।।[৫৭]

সন্ন্যাসধর্মের বড় কর্তব্য হল বিষয়বিমুখতা এবং সামাজিক মোহ ও সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। রাজদর্শন যাতে সন্ন্যাসধর্মের এই প্রতিশ্রুতিকে ভুলিয়ে দিতে না পারে; সন্ন্যাসীরা যাতে লক্ষ্যপথে স্থির থাকতে পারেন, চৈতন্যদেবের রাজদর্শন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সেই পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

সন্ন্যাসধর্ম পালনে চৈতন্যদেব যেমন কঠোরভাবে বিধি-নিষেধ মেনে চলতেন, তেমনই পারিষদদেরও সেই শিক্ষা দিতেন। তবে গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি তাঁর কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। সকলের প্রতি বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম পালন, দান, ধ্যানের মাধ্যমে নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক জীবনযাপন, অতিথিসেবা ও কৃষ্ণনামস্মরণ গৃহী বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'মধ্যলীলা'র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন শিবানন্দ সেন, মুকুন্দ দত্ত, সত্যরাজ খাঁন, রাঘবপণ্ডিত প্রমুখ গৃহীভক্তদের চৈতন্যদেব সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছেন —

প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।।
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে।।
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।।[৫৮]

সবসময় কৃষ্ণনাম গ্রহণকারী ভক্তদের আচরণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত দীনতাপ্রকাশ পায়। এছাড়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করাই বৈষ্ণব উপাসকদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর 'অন্ত্যলীলা'র নবম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন রাজকর্মচারীরা সঠিক সময়ে রাজার কার্য না করতে পারলে তাঁদের ফাঁসির শাস্তি পর্যন্ত হতে

পারত। রাজা যদি কর্মচারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন, তাহলেই একমাত্র সেই কর্মচারী মুক্তি লাভ করতে পারতেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভক্ত ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রের দুই লক্ষ কাহন ঠিক সময়ে ফেরত দিতে না পারায় তাঁর ঘোড়াগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং তাঁকে বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে দয়াপরবশ হয়ে প্রতাপরুদ্র কর্মচারী গোপীনাথকে বেতন দ্বিগুণ করে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং রাজকাহন অপব্যয় করতে নিষেধ করেছিলেন —

রাজা কহে সব কৌড়ী তোমারে দাড়িল।
মালজাঠ্যা দণ্ডপাঠ তোমায় বিষয় দিল।।
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হইতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।।[৫৯]

রাজা বৈষ্ণব হলেও বিষয়ী, তাই ঠিকভাবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়রক্ষা এবং রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কোনো গৃহীর রাজস্ব নষ্ট করা ঠিক ধর্ম নয়, কারণ গৃহী বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম সঠিক পথে থেকে সাংসারিক এবং কার্যক্ষেত্রের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। গোপীনাথ রায় এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় তাঁকে রাজবন্দী হতে হয়েছিল। রাজার দয়ায় গোপীনাথ শেষপর্যন্ত মুক্তি ও সম্পত্তি দুইই লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ গৃহী হয়ে কর্মজীবনে উদাসীন এবং রাজস্বনষ্ট ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম, বৈষ্ণবধর্মেও তার সমর্থন মেলে না। অন্যের ধন দান, অতিথিসেবা, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আপ্যায়ণ ইত্যাদি যেকোনো ধর্ম-কর্মই অন্যায়। সংসারে সকল ব্যক্তি যদি বিষয়বিমুখ হয়ে সন্ন্যাসধর্ম পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে সংসারধর্ম পালন এবং অতিথিসেবা করবে কে? তাই গৃহী বৈষ্ণবদের সৎপথে থেকে কর্মজীবন যাপন করার মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন কর্তব্য। গোপীনাথ রায় বিষয়বিমুখ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজার দয়ায় তিনি বিষয়ী হয়েছিলেন।

প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ।।[৬০]

চৈতন্যদেব গৃহীদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মকে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিলেও সকলকে সংসারে থেকে ধর্মপালনের পথ দেখিয়েছিলেন যার ইঙ্গিত *চৈতন্যচরিতামৃত* এবং *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। সত্যরাজ খান, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, মুকুন্দ ঘোষ, শ্রীবল আচার্য, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ গৃহী বৈষ্ণব উপাসকরা বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সংসারের প্রতি সব রকম দায়িত্ব সমানভাবে পালন করেছেন এবং গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও এঁরা নিজেদেরকেও সমানভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তৎকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এই বৈষ্ণবরা সামাজিক নানান বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশেষতঃ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণরা এবং পাষণ্ড দাম্ভিক ব্যক্তিরা গৃহী বৈষ্ণবদের নানাভাবে লাঞ্ছনা করতেন তার প্রতিচ্ছবি বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাতের অন্ধকারে গোপাল-চাপাল লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবক শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গনে চণ্ডীমূর্তি ও মদ্য-মাংস রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীবাস আচার্য ভণ্ড বৈষ্ণব একথা সকালবেলায় সকল সমাজপতির কাছে সত্য প্রমাণ করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত সমাজপতিদের কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার আগে নিজেই বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের সঙ্গে দোষস্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি সারাদিন নামসংকীর্তন করেন আর রাতে মদ্য-মাংস খেয়ে ভবানীপূজা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় তৎকালীন সমাজচিত্রের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় —

একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।।
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্র্যে শ্রীবাসের দ্বারা স্থান লেপিয়া।।
কলার পাত উপরে থুইলা ওড্র ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।।
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা দেখিলা।।

বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া।।
নিত্য রাত্র্যে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন।[৬১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি পাষণ্ড অবৈষ্ণবের অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে সৎপথে থেকে ভক্তি ভরে ধর্ম-কর্ম পালন করাই বড় ধর্ম।

চৈতন্যদেব জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। যবন হরিদাসের চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের আলিঙ্গনলাভ এবং পার্ষদ হিসেবে স্থানলাভ মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম নিদর্শন। পরবর্তীকালে যবন হরিদাসের কৃষ্ণভক্তির মহিমা বৈষ্ণবধর্মে এক অসামান্য নিদর্শন রেখে গেছে। তৎকালীন সময়ে যবন হরিদাস হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমাজপতি এবং অবৈষ্ণব পাষণ্ডদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে অক্লেশে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রচার করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গে নবদ্বীপের গ্রামে গ্রামে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন বলে বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন। *চৈতন্যভাগবত*-এ যবন হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অপার মহিমা বর্ণিত হয়েছে –

কর যোড় করি বোলে প্রভু হরিদাস।
মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ।।
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।।
সেই যে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম।।
তোমার স্মরণহীন পাপী জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।।
এহো মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহোঁ যে আমার যোগ্য নয়।।
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।

মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর।।
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে।।
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু না পুরয়ে আশ।।[৬২]

নগর কীর্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের সঙ্গে যবন হরিদাসের কথোপকথন, শ্রীবাস এবং অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্তনে অংশগ্রহণ, কাজী দলনে সর্বাগ্রে কীর্তন এবং দুই লক্ষ বার নিভৃতে বসে কৃষ্ণনাম গ্রহণের পর অন্নগ্রহণের মাধ্যমে যবন হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মহিমা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজও কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বৃদ্ধ যবন হরিদসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। তাঁর কঠোর ব্রতের সঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং প্রেমভক্তির প্রকাশ বৈষ্ণবভক্তদের ভক্তিধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এবং বৈষ্ণবাচারের দৃঢ় নিষ্ঠা ও কাঠিন্য *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে —

গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন।।
সংখ্যা-কীর্তন পুরে নাহি কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কিমতে উপেক্ষিব।।
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এর রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ।।[৬৩]

ধর্মীয় ভেদাভেদের উপরে মানবতাবোধ এবং ভক্তিধর্ম প্রকাশে যবন হরিদাস বৈষ্ণব জীবন যাপনের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছেন।

উপসংহার

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমাজ-সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছিল। একইভাবে তাঁর কর্মজীবন ও ধর্মাচরণ বাংলা সাহিত্যে এনেছিল এক নতুন মোড়। জন্ম নিয়েছিল

চরিতসাহিত্য নামে এক নতুন সাহিত্যধারা। এই সাহিত্যধারাই প্রথম মানুষের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। এখানে স্থান পেয়েছে সমাজ বাস্তবতা এবং কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তির ইতিহাস। ফুটে উঠেছে রচয়িতার দার্শনিক মনের পরিচয়। চরিতগ্রন্থগুলির পরতে পরতে বিশ্লেষিত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা।

আলোচ্য চরিতগ্রন্থে *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থদুটির পরতে পরতে রচয়িতাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বৃন্দাবনদাস চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের দার্শনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যদেব সর্বশাস্ত্রের পণ্ডিত হয়েও তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহংকার কখনও ছিল না। ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলে শত্রুতার বৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ও শত্রুকে বন্ধু করাই বড় মনের পরিচয়, যা চৈতন্যদেব তাঁর চলার পথে প্রতি পদক্ষেপেই করেছেন এবং বৈষ্ণব ভক্তদেরও সেই পথই দেখিয়েছেন।

সন্ন্যাসজীবন হবে সর্বদা নির্লিপ্ত যেখানে সাংসারিক বা সম্পত্তির কোনও মোহ থাকবে না আর যদি কোনও মোহ থাকে, তাহলে তাকে বুদ্ধি দিয়ে ত্যাগ করাই মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিত্র বর্ণনায় এমনই মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় দিয়েছেন।

চৈতন্যভাগবত এবং *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থদুটি আলোচনায় দেখা যায় সৎ পথে থেকে কর্মজীবন যাপন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান আদর্শ। তাই চৈতন্যদেবের আদর্শ যুগে যুগে মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র ::

১ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ৬।

২ তদেব, পৃ. ৬।

৩ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (১৯৯৭)। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*। কলকাতা : সোনার তরী। পৃ. ৪০।

৪ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ৬১।

৫ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত*, অন্ত্যঃলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ২৩১।

৬ ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৮৪)। *যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*। কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

৭ সরকার, আভা (২০০৩)। *মধ্যযুগে নবদ্বীপ*। কলকাতা : পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন। পৃ. ৯৫।

৮ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)।*চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৩০।

৯ দাস, ক্ষুদিরাম (২০১৫)। *বৈষ্ণবরস প্রকাশ*। দে'জ। পৃ. ১৭৯-১৮২।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) (২০০৭) *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ১৩৩-১৩৪।

১০ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত)। *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*। তদেব। পৃ. ১৩৩-১৩৪।

১১ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৬৬৯।

১২ তদেব। পৃ. ৭৭৫।

১৩ সেন সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত*, মধ্যলীলা, দ্বিতীয় অধ্যায়। তদেব। পৃ. ৯০।

১৪ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৫০।

১৫ তদেব। পৃ. ৫৭।

১৬ তদেব। পৃ. ৬৫৯।

১৭ তদেব। পৃ. ৬১৭।

১৮ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত)। *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন। পৃ. ১৩৭।

১৯ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (২০০৯)। *বৈষ্ণবপদাবলী*। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। পৃ. ১৫।

২০ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগত*, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ.১১৭।

২১ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, আদিলীলা, অষ্টম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২১।

২২ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যলীলা, ষড়বিংশ অধ্যায়। তদেব। পৃ. ২০৬।

২৩ *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৯০-১৯৩।

২৪ দাস, ক্ষুদিরাম (২০১৫)। *বৈষ্ণবরসপ্রকাশ*। কলকাতা : দে'জ। পৃ. ১৯০-১৯৩।

২৫ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। তদেব, পৃ. ৫৮৪-৫৮৫।

২৬ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)।*শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যলীলা, অষ্টম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১১৫।

২৭ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)।*চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫০।

২৮ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (২০০৯)। *বৈষ্ণবপদাবলী*। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৯।

২৯ তদেব। পৃ. ১৪।

৩০ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণবপদাবলী*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৫৯।

৩১ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (১৩৯৬)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৯৫।

৩২ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৭৫।

৩৩ নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) (১৯৯৩)।*শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*। কলকাতা : সাধনা প্রকাশনী। পৃ. ৩৮।

৩৪ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫।

৩৫ *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৬।

৩৬ নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) (১৯৯৩)।*শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা*। তদেব। পৃ. ১১২।

৩৭ সেন, সুকুমার (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৬।

৩৮ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫০।

৩৯ মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, পৃ.৪০ ।

৪০ তদেব। *বৈষ্ণব পদাবলী*। পৃ. ৪২৮।

৪১ দাসগুপ্ত, শশিভূষণ (১৩৯৬)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। পৃ. ২৬৬।

৪২ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫।

৪৩ *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৭।

৪৪ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৫০।

৪৫ দাশগুপ্ত, শশীভূষণ (১৩৯৬)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। তদেব। পৃ. ২৩৯-২৪০।

৪৬ সান্যাল, অবন্তীকুমার ও অশোক ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) (২০০২)। *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী। পৃ. ২৬৬-৬৭।

৪৭ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৫৭।

৪৮ সরকার, আভা (২০০৩)। *মধ্যযুগে নবদ্বীপ*। কলকাতা : পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন। পৃ. ৪৭-৪৮।

৪৯ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুশেখর (১৯৯৭)। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*। তদেব। পৃ. ৯৯-১০০।

৫০ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১২০।

৫১ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৮৬-৮৭।

৫২ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৯২।

৫৩ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৭২।

৫৪ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৭০।

৫৫ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৩২।

৫৬ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২৪৫।

৫৭ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)।*চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৮৭।

৫৮ *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১০৯।

৫৯ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২০৪।

৬০ *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২০৫।

৬১ *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৩৩।

৬২ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায়। তদেব। পৃ. ১২৮-১২৯।

৬৩ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২১০।

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের বিভাজন এবং বৈষ্ণব রসপ্রস্থান

ভূমিকা

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে নতুন যুগ ও নতুন রসের ব্যাখ্যা সূচিত হয়েছিল। তাঁর কর্মজীবন ও ধর্মাচরণ তৎকালীন সময়ে যেমন বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনই তাঁর তিরোভাবের পর বহু কবি, সাহিত্যিক অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে চরিত সাহিত্য নামে এক নতুন সাহিত্যধারার জন্ম দিয়েছিল। এই চরিত সাহিত্যের ধারার মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস, জাতিভেদ প্রথা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি উঠে এলেও চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি প্রচারের ইতিহাস স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

চরিত সাহিত্যের রচনা চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বিভাজনের ইতিহাস চরিত গ্রন্থগুলিতেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থদুটি আলোচনার মাধ্যমে সেই ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করব।

চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম নামে বিভাজিত হয়ে গেলেও চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি প্রেমের প্রভাব এই সম্প্রদায়গুলিতে কতটা পড়েছে এবং এই দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায় কোথায় আলাদা হয়ে গেছে, পঞ্চরস কী এবং এই রসের ব্যাখ্যা কোথা থেকে সূচিত হয়েছিল, চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম কীভাবে জনসংযোগ ঘটিয়েছিল, সেই ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করব এই আলোচনায়।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কীভাবে চৈতন্যদেবের রাধা ভাবদ্যুতি সুললিত ভাবে অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ আর বাহিরে রাধাভাব বর্ণনা করেছিলেন, চৈতন্যদেব কীভাবে শেষ জীবনে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সেই বর্ণনা আলোচনার মধ্য দিয়ে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের ইতিহাস খোঁজার এবং বৈষ্ণবদের কাছে কান্তা প্রেম কেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল এই চরিতগ্রন্থগুলি আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের বিভাজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

ইউরোপীয় সাহিত্যে পঞ্চদশ শতকে নবজাগরণের জোয়ারে জন্ম নিয়েছিল গ্রিক সাহিত্য। সেই সময় থেকেই সভ্যদেশে পরিণত হয়েছিল ইউরোপ। ভারতবর্ষে ঐ সময় আধুনিকতার নবজাগরণ না ঘটলেও প্রায় অন্ধকার কেটে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপ শহরে চৈতন্যদেবের অকলঙ্ক চন্দ্ররূপে আবির্ভাব ঘটেছিল —

> অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
> সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন।[১]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও তৎকালীন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়েছিল। *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*-এর পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নানা পদ রচিত হয়েছিল মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও গ্রাম্যকবি চণ্ডীদাসের প্রতিভায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যেমন বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশিত হত, তেমন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের আন্দোলন ও তার কর্মপন্থা বেশ কয়েকশো বছর ধরে চলেছিল। ষোড়শ শতকের শুরুতে চৈতন্যদেব এই বৈষ্ণব আন্দোলনের পটভূমিকা মজবুত করে দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস আচার্য, নরহরিদাস, গদাধর পণ্ডিত প্রমুখ যেমন বাংলায় কাজ করেছিলেন, তেমনই উত্তরভারত তথা বৃন্দাবনে মহাপ্রভু পাঠিয়েছিলেন রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর

রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী এসে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তবে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ও তাঁর আবির্ভাবের সমকালে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ছিল সেই বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব সমান পরিপূর্ণভাবে যুক্ত হয়ে আছে। মৈথেলী কবি বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলী এবং মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে সেই নিদর্শন রয়েছে। চৈতন্যদেব একদিকে যেমন বাংলা তথা নবদ্বীপে কীর্তন প্রধান বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গিয়ে সনাতন গোস্বামীসহ আরও পাঁচজন গোস্বামীর সহায়তায় বৃন্দাবনে নতুন বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন যা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে অভিহিত হয়েছিল। চৈতন্যপরবর্তী সময়ে নিত্যানন্দ, জাহ্নবা দেবী, বীরভদ্র প্রমুখের প্রচারের ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ছড়িয়েছিল। এই বৈষ্ণবধর্মের দর্শন ও সাহিত্য ছিল আলাদা প্রকৃতির।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বেশ কিছু দিনের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে বিভাজন ঘটেছিল। এই বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে বিভক্ত হয়ে যায়। কারণ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে মধুর রসের প্রাধান্য বেশি থাকা সত্ত্বেও এক ধরনের যৌনতা বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবুকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ফলে বিষ্ণুর সাধনার জন্য একজন সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের দরকার হত একজন বৈষ্ণবীর। এই বৈষ্ণবদের কাছে গুরুত্ব ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও নৌকা লীলা বিষয়ক ভাবসাধনা। এই বৈষ্ণবদের কাছে আত্মত্যাগ বড়ো ছিল না, আত্মতুষ্টি ছিল বড়ো। এই প্রভাব বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনে তখনই যুক্ত হয়েছিল যখন চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়া বন্ধ হয়েছিল। তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কিছুটা রূপান্তরিত করে নিয়ে তৈরি হয়েছিল রাধাতন্ত্রের মত এক বিশিষ্ট ধর্মাশ্রয়ী শাস্ত্র।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধা হলেন কৃষ্ণের শক্তি। সেই কারণে কৃষ্ণ তন্ত্রসাধক , শক্তিসাধনা কৃষ্ণের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ, এইভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভিন্ন শাখা সৃষ্টি হয়েছিল।[২] চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মূলকথা ছিল ভক্তিপ্রেম অর্থাৎ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি বড়ো। ভক্তি এবং বিশ্বাসের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করা সম্ভব হয়। চৈতন্যদেব প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্মে কোনও আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরতা ছিল না। চৈতন্যদেব মৃত্যুর পর এই বৈষ্ণবধর্মে নিজেই দেবতা রূপে স্থান পেয়েছিলেন। মহাপ্রভুর জীবনকাহিনি নিয়ে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর সঙ্গে অন্যান্য ভক্ত পরিকরেরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক নানা সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর জীবনকাহিনি নিয়ে নামগান শুরু হয়েছিল। মহাপ্রভুর বিগ্রহ তৈরি করে একদল বৈষ্ণব ভক্তি ভরে পূজাপাঠ শুরু করেছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের সূচনা হয়েছিল। অদ্বৈতাচার্য সহ বহু ভক্ত পরিকর তাঁকে ঈশ্বর বলে মানতেন। অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল অন্তরঙ্গ যোগসাধনার সঙ্গে দেহতত্ত্বের সংমিশ্রণ। এই বৈশিষ্ট্যটি বৈষ্ণবধর্মের বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রধান পার্থক্য। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্র দর্শন ও সাহিত্যের ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লাভ করেছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্যকে সহজিয়া বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নিজ নিজ মতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে সাধনার লক্ষ্য নিজেকে জানা এবং নিজের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা। নিজেকে জানা অর্থাৎ 'আত্মানং বৃদ্ধি' — এটা বৈদিক সাধনার সারমর্ম।[৩] সহজিয়ারা এই দেহতত্ত্ববাদ পেয়েছিলেন বৌদ্ধ মহাযান থেকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সহজযান থেকে। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারকালে বাংলদেশে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রবল হয়েছিল। সেই সময় মহাযানদের শূন্যবাদ সহজযানদের দেহতত্ত্ববাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছিল। তাঁরা

নিজেদের দেহের মধ্যে বুদ্ধের কল্পনা করতেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই সহজযান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা সবসময় ভক্তির পথেই থাকতেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের স্বাদ আস্বাদন করাই নিজেদের চরম পাওয়া বলে মনে করতেন। তাঁরা সর্বদা নিজেদেরকে রাধাকৃষ্ণের সেবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতেন। আর কৃষ্ণনাম ও শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিষ্ণুর পাদপদ্মে সমর্পণ করতেন। সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রধান লক্ষ্য প্রজ্ঞার উদ্বোধন। সহজিয়া বৈষ্ণবরা শান্ত উপায়ের দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ করে প্রেমভক্তির সাধনা করেই ভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করে ভগবানের সদৃশ অর্থাৎ *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ বর্ণিত রাসলীলায় গোপিনীদের আনন্দ উপলব্ধির মত নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ উপলব্ধিকে একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন। তাঁরা চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার নীলাচল মাহাত্ম্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

কলিযুগে কৃষ্ণরাধার ভাব স্বীকার করে নবদ্বীপে শচীগৃহে চৈতন্যদেব জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বাপরে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় মহিমা বর্ণিত হয়েছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* প্রভৃতি কাব্যে। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর দশম ও একাদশ স্কন্দে এই বর্ণনা রয়েছে। রাধার প্রণয় মহিমার স্বরূপ কী, যে প্রেমের দ্বারা রাধা কৃষ্ণের অন্তঃসৌন্দর্য্য ও মাধুর্যরস আস্বাদন করেছিলেন; রাধার সেই আস্বাদনের স্বরূপ কী ছিল এবং ঐ আস্বাদনের দ্বারা রাধা কী কেমন আনন্দ উপলব্ধি করতেন – সেই উপলব্ধি অনুধাবন করার জন্য কৃষ্ণ নিজে কলিযুগে মানবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই বঙ্গের বৈষ্ণবসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস, রাধাকৃষ্ণ উভয়েই একীভূত গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর অন্ত্যলীলায় চৈতন্যদেবের অন্তিম জীবনে রাধাভাবে ভাবিত দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে বৈষ্ণব সহজিয়ারা রাধাকৃষ্ণের যুগ্মতনু স্বরূপ মনে করেন।[৫]

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পূর্বেই ধীরে ধীরে সহজিয়াদের তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। গৌরাঙ্গ গয়ায় ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে মন্ত্রলাভের পর নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে নবদ্বীপে ফিরেছিলেন। তিনি সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমে তিনি নবদ্বীপ মাতিয়ে তুলেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকলেও তাঁর প্রতিবাদী সত্তা ছিল দৃঢ়। তাই তিনি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়েই দমন করেছিলেন। জগাই-মাধাই, গোপাল চাড়ালের পাষণ্ডতার পাশাপাশি তিনি দমন করেছিলেন কাজীর অন্যায়-অত্যাচার। এইভাবেই দৃঢ় প্রতিবাদ ও কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তির দ্বারা তিনি নবদ্বীপ তথা সমগ্র বাংলায় বইয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার, ঘটিয়েছিলেন জনসংযোগ।

নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফেরার এক বছরের মধ্যে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করে নীলাচলে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। ঐ সময় থেকেই বাংলায় অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও নরহরিদাস বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে বিশদভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাই তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাজে সঠিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন নি। তাছাড়া শেষ বয়সে তিনি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে বড়ো করে দেখতেন বলে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অন্যদিকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ছিলেন অবধূত। রাঢ় অঞ্চলের একচাকা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। শৈশবে তাঁর নাম ছিল কুবের। তাই তিনি জাতপাতের উপরে গিয়ে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে একসঙ্গে একইসূত্রে জীবন কাটানোর শৈশব জীবন হয়তো তাঁর শৈশবের স্মৃতিকথা মনে পড়ত। তাই তিনি সকল ধর্মের মানুষকে নির্দ্বিধায় বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিতে পেরেছিলেন। সেই সময় বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জোয়ার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নবদ্বীপে কাজের লোক পাওয়া যেত না, হাটবারে হাট থাকত শূন্য। বৈষ্ণব

অবধূতের সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি দেখে চৈতন্যদেবকে অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দের হাতে লিখে পাঠিয়েছিলেন—

বাউলকে কহিয় লোক হইল আউল
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকাই চাউল
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা করিয়াছে বাউল।। [৬]

নিত্যানন্দের ঔদার্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। নিত্যানন্দ এই ঔদার্য কট্টর বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য মেনে নিতে পারেননি, কারণ তৎকালীন তান্ত্রিকদের কদাচার তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। তিনি নিত্যানন্দের দ্বারা তান্ত্রিকদের বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের উদাসীন আচরণ মেনে নিতে পারেন নি।

বৈষ্ণবধর্মের জনসংযোগে চৈতন্যদেবের প্রভাব

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা বিস্তার লাভ করেছিল। জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* ছাড়াও গোবর্ধন, উমাপতি ও স্বয়ং লক্ষ্মণসেন রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে বহু ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করেছিলেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগের ইতিহাস বর্ণনা করলে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমধর্মের ইতিহাস আলোচনায় পুরাণ, *ভাগবত*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত বিষ্ণুর অবতার রূপে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্য ভক্তিধর্মের সম্পর্কে অবগত ছিলেন। চৈতন্যদেব প্রচারিত ভক্তিধর্মে বেদ, উপনিষদ বা ভগবানের অন্য কোনও পূর্ণ অবতারের প্রচার হয়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রতিষ্ঠিত প্রেমধর্মের আদি প্রচারক ছিলেন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পরমানন্দ পুরী, পশ্চিম প্রান্তে শ্রীরঙ্গপুরী, পূর্বপ্রান্তে পুণ্ড্ররীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত আচার্য এবং উত্তর ভারতে ঈশ্বরপুরী ও মাধবেন্দ্রপুরী। এই ভাবেই ধীর গতিতে মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর শিষ্যেরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রচারের পটভূমি তৈরি করার প্রয়াস করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* — এই দুই গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় চৈতন্যদেব গয়া যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণভক্তিপ্রেমে আপ্লুত ছিলেন না। তবে ঐ সময়েও নবদ্বীপে কৃষ্ণের নামগান হত। *চৈতন্যভাগবত*-এ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, গোপীনাথ, মুরারী গুপ্ত, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রমুখ চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের আগে থেকেই হরিনাম সংকীর্তন ও বিষ্ণুসেবা করতেন।[৭] মধ্যযুগে যে সকল ধর্মসংস্কার আন্দোলন উত্তর ভারতে গড়ে উঠেছিল চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্মীয় আন্দোলনে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল। তবে বৈদিক ব্রাহ্মণরাই প্রথম বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী ছিলেন। সাধারণ জনজাতির মধ্যে এই বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের মোড় ফিরে গিয়েছিল। ফলে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ স্থান পেয়েছিলেন। সেই কারণে রামানন্দ, কবীর, দাদু প্রমুখের প্রচারিত ধর্ম থেকেই বৈষ্ণবধর্মের স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল।

বাংলায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মীয় আন্দোলনের দ্বারা জনসংযোগের জোয়ার এসেছিল। তবে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম নতুন নয়, প্রাচীন কালেও এই বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, বল্লভাচার্য, নীলাম্বর চক্রবর্তী, জগন্নাথ মিশ্র, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি ভক্তিভাবের দৃষ্টান্ত *চৈতন্যচরিতামৃত* ও *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের বর্ণনায় স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ, নরোত্তমদাস ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট সাধকগণ বৈষ্ণবধর্মের সারা বাংলায় প্রচারের পরিকল্পনা করেন। অন্যদিকে চৈতন্যপরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের এই স্রোতের কর্ণধার হয়েছিলেন গোস্বামী প্রভুদের দল। তবে সকল বৈষ্ণব গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের আচার-রীতি-নীতির বিরোধ থাকলেও সনাতনপন্থী ধর্মগুলি থেকেই চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম আপাততভাবে উদার। চৈতন্যদেব বিষ্ণুভক্ত শূদ্র রামানন্দকে প্রথম দর্শনে আলিঙ্গন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে সন্ন্যাসীর এই উদারতা ব্রাহ্মণদের ভালো লাগেনি। কারণ তিনি সন্ন্যাসী হয়েও

ব্রাহ্মণ। তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণের শূদ্র আলিঙ্গন ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজবিরোধী সংস্কার। অনেক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হয়েও সামাজিক কুসংস্কার মুক্ত নির্লিপ্ত জীবন অতিবাহিত করতে পারেন নি।

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণসব করেন বিচার।।
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন।।[৮]

পুরীতে হরিদাস এসে চৈতন্যদেবের সাহচর্যে বসবাস করেছিলেন। সার্বভৌম মুখোপাধ্যায় হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দেখে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে জাতিধর্মের গোঁড়ামি মানুষের মন থেকে ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য যবন হরিদাসের আবির্ভাব ঘটেছে। চৈতন্যদেব সহ তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবভক্তরা সনাতন গোঁড়ামি ভেঙে আচণ্ডালে প্রেম দান করেছিলেন। এইভাবেই বৈষ্ণবধর্মের উদার ধর্মনীতির পরিচয়ের নিদর্শন *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ বর্ণিত হয়েছে।

চৈতন্যদেব সহজ প্রেমভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত সেই ধর্মে কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ছিলেন কৃষ্ণ উপাসক। তাই দেখা যায় তাঁর সাধনায় শ্রীরাধার ভাবমূর্তি প্রকাশ পেয়েছিল। তবে অন্য কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের বা দেবতার প্রতি চৈতন্যদেব কখনও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন নি। নবদ্বীপ থেকে পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে দক্ষিণ ভারত, কাশী, বৃন্দাবন সহ সমগ্র ভারত ভ্রমণের সময় সমস্ত ধর্মের দেবতার স্থান দর্শন করেছিলেন। কারণ চৈতন্যদেবের কাছে বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কোনও বিভেদ ছিল না।

চৈতন্য আদর্শের প্রতিগ্রহণ : গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও সহজিয়া বৈষ্ণবদর্শন

চৈতন্যদেবের প্রেমসাধনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। চৈতন্য বিগ্রহে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় প্রকাশের ব্যাপারে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ফুটে উঠেছিল। বৈষ্ণবধর্মের এই দার্শনিক তত্ত্ব উচ্চবর্গের সাধনমার্গের জন্য। তবে সাধারণ বৈষ্ণবভক্তের আচরণীয় ধর্ম

পাঁচটি যা মহাপ্রভুর জীবনীর মধ্যে পাওয়া যায়। পাঁচটি বিধি — ১) কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা আলোচনা ও ভক্তিভাবের প্রকাশ; ২) কৃষ্ণনাম উচ্চারণ বা জপ; ৩) কৃষ্ণলীলা শ্রবণ; ৪) দৈহিক ভ্রমণ, মানসিক ভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলায় সেবকের ভূমিকা, বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-স্মরণ; ৫) কৃষ্ণবিগ্রহের পূজা ও তাকে স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বাস রাখা।[৯]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধনার ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়সমূহকে অবদমিত করে নির্বিকার চিত্তে সাধনা লাভ করা। অন্যদিকে সকল ইন্দ্রিয় সজাগ ও সক্রিয় রেখে সহজ পথে ঈশ্বর সাধনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অবদমিত না করে নির্বিকার চিত্তে ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে নারীপুরুষের মিলিত সহজসাধনা সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের মূল ভিত্তি। বাংলার বৈষ্ণবভক্তেরা চৈতন্যদেবকে অবতার রূপে মানতেন। অন্যদিকে বৃন্দাবনের বৈষ্ণবভক্ত পরিকরেরা চৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ অনুধাবন করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বা স্বয়ংকৃষ্ণ রূপে অভিহিত করেছেন। যেমন জগাই-মাধাই উদ্ধার কাহিনি বর্ণনায় দেখা যায়, পাষণ্ড মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় মুটকী ছুঁড়ে মারলে তাঁর মাথা রক্তাক্ত হয়ে যায়। সেই রক্ত দেখে ক্রুদ্ধ হন চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন —

নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু সেই দুইর ভিতরে।।
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে।।
আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল।।[১০]

অর্থাৎ কলিযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কৃষ্ণের আর এক রূপ। বৃন্দাবনদাস সেই তথ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনায় চৈতন্যদেব অবতার রূপে কখনও হরি, কখনও কৃষ্ণ বলে উল্লেখিত হয়েছেন। আর বলরামের কলিযুগে আবির্ভাব নিত্যানন্দ মহাপ্রভু রূপে — *চৈতন্য*

ভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* উভয় গ্রন্থেরই এটাই মূল প্রতিপাদ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক কাঠামোর একদিকে আছে চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসাধারণ কঠোরতা, বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে রাধাভাবে কৃষ্ণের সাধনায় সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে দক্ষিণ ভারতভ্রমণের সময় গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরের রাজকর্মচারী রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণকথার আলোচনা প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে রায় রামানন্দ চৈতন্যদেবকে যে পঞ্চরসের বর্ণনা শুনিয়েছিলেন সেগুলি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের মধ্যে দাস্য ও মধুর রসের ভাব চৈতন্যদেবের সাধনায় সবথেকে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি বড়। রামানন্দ চৈতন্যদেবকে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা শুনিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি অর্জন করতে পারে তার কাছে স্বধর্মাচরণ, স্ব-ধর্মত্যাগ, কৃষ্ণচরণে কর্ম অর্পণ ও জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি তাদের ধর্মাচরণে বাধা হতে পারে না। কারণ, তাঁরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। জ্ঞানশূন্য ভক্তির দ্বারা সাধ্য বা অভিষ্ট বস্তু লাভ অনুকূল। জ্ঞানশূন্য ভক্তির দ্বারা ভক্ত ভগবানকে লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করার তারতম্য আছে, কারণ সকলের ভগবান সেবার বাসনা-কামনা একরূপ নয়। কারোর কাছে শ্রেষ্ঠ ভগবান, কেউবা কৃষ্ণের দাস, কেউ কৃষ্ণের সখা, কেউ কৃষ্ণকে শিশুরূপে আবার কেউ কৃষ্ণকে প্রেমিকরূপে পেতে চান। রামানন্দ কৃষ্ণকথা আলোচনার সময় উজ্জ্বল বা মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে এই উজ্জ্বল রসের ভূমিকা গৃহীত হয়েছে।

গয়া প্রত্যাবৃত চৈতন্যদেব কৃষ্ণভাবাবেশে ভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে মূল ও সহজ কর্মপথ ছিল কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণের নামগান। বাংলায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* ইত্যাদি পাঠ ও *শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ* পাঠ-আলোচনা বৈষ্ণব সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। নিমাই শৈশবে নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠগ্রহণ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত নিমাই মুকুন্দ ঘোষের বাড়িতে

পাঠশালা খুলে নামে ছাত্রদের ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ দিতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন এবং ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্রলাভের ফলে তিনি কৃষ্ণ নামমাহাত্ম্য প্রচারের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের পতিত মানুষদের উদ্ধার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি সর্বদা কৃষ্ণভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। ঘর্ম, অশ্রু, কম্পন, হুঙ্কার ইত্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব তাঁর মধ্যে দেখা দিত। কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছু তাঁর স্মরণে আসতো না। তাই ছাত্রদের পাঠদানের কর্ম ত্যাগ করে পতিত জাতির উদ্ধার এবং কৃষ্ণনাম স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তিকেই তিনি চূড়ান্ত বলে মনে করতেন —

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে।। [১১]

তাঁর কাজীদলন, পাষণ্ড জগাই-মাধাই উদ্ধার, পাপী গোপাল-চাপালের মুক্তিলাভ এবং নগরকীর্তনের প্রচারের ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীধর, তন্তুবায়ী, গোয়ালা, গন্ধবণিক প্রমুখ পতিত, নিম্নবৃত্ত, নির্যাতিতের ঘরে গিয়ে জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুর সংস্কারকে ভেঙে দিয়েছিলেন।

বৈষ্ণবধর্মের জনসংযোগে চৈতন্য পরিকরগণের ভূমিকা

সন্ন্যাসগ্রহণের পরে চৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়ে পরবর্তী কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলা তথা নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নরহরি সরকার প্রমুখ বৈষ্ণবধর্মের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং শাসকশ্রেণির অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় মানবজাতিকে বাঁচাতে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন নগর সংকীর্তন। ফলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল, বিচ্ছিন্নতার সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে জনসংযোগ ঘটেছিল। অন্যদিকে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের নতুন দিক প্রতিষ্ঠা করার জন্য রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে নিজেই কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন।

মহাপ্রভুর সাক্ষাৎলাভের জন্য সনাতন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফেরার পথে ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিলেন । তাই তিনি সংকল্প করেছিলেন নীলাচলেই রথের চাকায় আত্মত্যাগ করবেন । চৈতন্যদেব সনাতনের মনোভাব বুঝতে পেরে আলিঙ্গনের মাধ্যমে সনাতনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন । কারণ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উত্থান ঘটানোর তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত সনাতনের আত্মগ্লানির মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে —

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কন্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া।।
ঘৃণা করি আলিঙ্গণ না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে।।[১২]

এইভাবেই অকপট চৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করে দৈন্যতা ও মালিন্য ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবনে বাসকালে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের লীলাকাহিনিকে কেন্দ্র করে ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া চৈতন্যদেবের নির্দেশে রূপ গোস্বামীসহ আরও পাঁচজন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহযোগিতায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন গড়ে উঠেছিল। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য নীলাচল থেকে দক্ষিণভারত সহ সমগ্র ভারতে ছয় বছর ধরে ভ্রমণ করেছেন। তিনি গোপীভাব, রাধাভাব, কৃষ্ণকথা প্রভৃতি বিষয়ে রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে শুনে কৌতূহল নিবৃত্তি করেছিলেন। তাঁর চিত্তে নব ভক্তিধর্মের ভাব জাগরিত হলেও তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাতত্ত্ব রচনা করেন নি। যদি কেউ এই বিষয়ে জানার জন্য প্রার্থী হতেন তাহলে তাঁকে তিনি রায়রামানন্দ কিংবা স্বরূপ দামোদরের কাছে যেতে বলতেন। তবে চৈতন্যদেব স্বয়ং রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্বশিক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য এবং সনাতনের দেহকে নিজের সাধনার বস্তু বলে দাবী করেছিলেন –

তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।।
ভক্ত-ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম যেবা প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষন।[১৩]

এই নব ভক্তিধর্ম সম্পর্কে যা কিছু উপলব্ধি এবং বাণী তা রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে উল্লেখিত রয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম সাধনায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের ভূমিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও অমিল নেই। কারণ উভয়ধর্মের ভাবসাধনা অন্তরের বস্তু। তা সত্ত্বেও সাধনপথের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মাচরণ শাস্ত্রীয় সম্মতির বন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে ক্ষেত্রে হৃদয়ের থেকে পাণ্ডিত্যের ভূমিকা বেশি। অন্যদিকে সহজিয়া সাধনা অনেক বেশি অশাস্ত্রীয় ও সমাজ শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। পতিত, নিম্নবৃত্ত মানুষই সমাজের গোঁড়ামীকে ভেঙে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। এই সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বাংলা ও ঊড়িষ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে এই বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্বের বিশেষ ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম সাধনার এই ধারাকে ভক্তিরসের দ্বারা পরিপূর্ণ করে সুদৃঢ় ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং অন্তরের তত্ত্ববস্তু কেমন ছিল তা *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গীতিকাব্য *গীতগোবিন্দ*-র মধ্যে এই গীতিকাব্যটি বৈষ্ণব পদকর্তাদের যেমন অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থকে

ভক্তিরসশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে ধর্মপুস্তকের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর মতো ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়দেব *গীতগোবিন্দ* রচনা করেছিলেন কি না তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁর ভক্তিধর্মের প্রচার *গীতগোবিন্দ* রচনাকালের মধ্যে প্রায় তিনশত বছরের ব্যবধান। কবি জয়দেব *গীতগোবিন্দ*-র মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যানকে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন। তিনি কাব্যর বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পার্থিব মানুষের বৈচিত্র্য, বৈভব ও মনন ফুটিয়ে তুলেছেন। জয়দেবের রচিত এই গীতকাব্যের মধ্যে প্রেমের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, যা পাঠের মাধ্যমে মানব-মানবীর চিত্ত বিনোদন হয়েছে। *গীতগোবিন্দ*-এর কেন্দ্রে অবস্থিত নায়িকা রাধা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* পুরাণ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী রূপে রাধা প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত নেই। একমাত্র *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ রাধার উল্লেখ রয়েছে। যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় চিত্রের মধ্যে রাধার প্রণয়িণীরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। আপাতভাবে জয়দেব গীতিকাব্যর সূত্রটি এই পুরাণ থেকে নিয়েছেন বলে অনুমান করা যায়।[১৪]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, পদাবলীকার চণ্ডীদাস প্রমুখের ভাবকল্পনায় রাধা নানা রূপে ধরা দিয়েছেন। কৃষ্ণের মত রাধাচরিত্রে মানবহৃদয়ের মধ্যে ভক্তিরসের স্থান পেয়েছে। কারণ আধ্যাত্মিক জগতে রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে। এছাড়া পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের গভীরতা ফুটে উঠেছে। তবে রাধাপ্রেম কী বস্তু এবং রাধাভাব সাধনা কীরূপ চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত হয়ে শেষজীবনে সেই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। সেই সত্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা'য় বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি মার্গে রাধাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবনরহস্যের মর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাবসাধনায় রাধার মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী প্রমুখ

চৈতন্যদেব প্রচারিত ভক্তিধর্মে রাধা-কৃষ্ণের উপর তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে।

রাগানুগা ধর্মসাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এদের মধ্যে মাধুর্য রাগের ভাবসাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিয়েছেন এবং রাধার প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলে গণ্য করছেন। তবে তারা অপর চারটি ভাব সাধনাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় শুধুমাত্র মধুর ভাবের সাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ রাধাভাবের সাধনাই তাদের কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সাধনা। কান্তাপ্রেমের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ রাধার প্রেমকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ অপ্রাকৃত, বৃন্দাবনের অলৌকিক বস্তু বলে মনে করেন। রাধার এই প্রেমকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সাধকরা কল্পলোকের আদর্শরূপে স্থাপন করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকরা রাধার ভাবসাধনাকে বাস্তব জীবনে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাধার প্রেমকে পরকীয়া নামে অভিহিত করে অলৌকিক জগতে তার স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সহজিয়ারা রাধার প্রেমকে বাস্তবে স্থান দিয়েছেন। তারা সাধনার অঙ্গ হিসেবে সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করে পরকীয়া ভাবসাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভাবেই গৌড়ীয় এবং সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মসাধকদের ধর্মসাধনার মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে।[১৫]

চৈতন্যদেব বাংলায় যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করছিলেন তাঁর তিরোভাবের পরে তা চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে –

ক) অদ্বৈত আচার্যের অনুসরণকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি রাগানুরাগা ভক্তির তুলনায় বৈদিক ভক্তির পথকে প্রধান বলে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভক্তিধর্মে মাধুর্য ভাবের থেকে ঐশ্বর্যভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তিভরে নাম জপ এবং শাস্ত্র অনুমোদিত নিয়ম শুদ্ধাচারে পালন করা ও ঠাকুরসেবা বৈষ্ণবের অবশ্যকর্তব্য বলে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা মনে করেন।

খ) নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ছিলেন অবধূত। তাই তিনি অনায়াসে নিজ ধর্ম ছাড়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ এমনকি তান্ত্রিকদেরও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিতেন। এর ফলে সকলে বৈষ্ণব হলেও বৈষ্ণবোচিত নিয়মপালন ও জীবনযাপন করতেন না। এঁরা নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

গ) উত্তর রাঢ়ে নরহরিদাস সরকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেছিলেন। যদিও এই অঞ্চল পূর্বে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান ছিল। তা সত্ত্বেও নরহরি সরকার ঠাকুরের সাধন-ভজনে কোন তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়েনি। তবে পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলের স্থানমাহাত্ম্যের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মের উপর পড়েছিল বলে অনুমান করা যায়। নরহরিদাস সরকার ও লোচনদাস প্রবর্তিত এই সম্প্রদায় গৌরনাগর ভাবসম্প্রদায় নামে অভিহিত। এঁরা রাগানুগা পদ্ধতিতে চৈতন্যদেবকে নাগর ও নিজেদেরকে নাগরী বলে ভাবতেন।

ঘ) গদাধর প্রবর্তিত সম্প্রদায় গদাধর সম্প্রদায় নামে অভিহিত। ইনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন। এঁরা কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্যের পাশাপাশি চৈতন্যদেবের নামমাহাত্ম্য করতেন। এছাড়া তিনি অদ্বৈত আচার্যকেও সমর্থন করতেন।[১৬]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সাধনপথ

সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার মূলত দুটি দিক। একটি মর্মসাধনা, অপরটি বাহ্য সাধনা। বাহ্য সাধনা অর্থাৎ পরকীয়া সাধন — সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রকৃতির অনুকূলে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণের সাধনা লাভ করা আর যখন কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক রতি উৎপন্ন হয় তখন তাকে মর্মসাধনা বলেন। এই সাধনাটি মহাপ্রভুর শেষ জীবনে প্রেমভক্তির রাগ সাধনার আদর্শ হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে। রাধাকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে, রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপে চৈতন্যদেব কলিযুগে জগৎ সংসারে আবির্ভূত হয়ে নবদ্বীপলীলা ও নীলাচল লীলার মধ্য দিয়ে প্রেমিক-সাধকরূপে প্রেম-ভক্তির বীজ বপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নিজের জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে প্রেমের সাধনা কীভাবে করতে হয়। বিশুদ্ধ নির্মল রাগ যে প্রেমের লক্ষণ তা জগৎবাসীকে দেখানোর জন্য তাঁর গৌর

লীলার আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উত্থান ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়েছিল রাধা-কৃষ্ণের যুগল অবতারের ভাব। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ চৈতন্যদেবের অন্তিম জীবনের ভাবপ্রকাশের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বেশ কিছু বছর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্যায়ের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেম-ভক্তির তুলনায় সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। কারণ দেহতত্ত্বের সঙ্গে তন্ত্রসাধনা ও আধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে, অর্থাৎ সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকরা রাধাভাবে ভাবিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রেমের সাধনা করেন। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা আধ্যাত্মবিজ্ঞানকে প্রেম-ভক্তি অনুশীলনে বাঁধা মনে করে অবিমিশ্র ভক্তির অনুসরণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সময় রাগানুগা ধর্মাচরণের কোনো লিখিত বিবরণ রেখে যান নি। চৈতন্যদেবের শিক্ষার উপর নির্ভর করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রাগানুগা ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই তত্ত্বের সঙ্গে তন্ত্রসাধনা ও দেহতত্ত্বকে যোগ করে তান্ত্রিক সম্প্রদায় সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে অভিহিত। এভাবেই বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসৃত রাগানুগা ধর্মের সঙ্গে তন্ত্র অনুযায়ী দেহতত্ত্ব যোগ করে বৈষ্ণব সহজিয়ারা অভিনব পৃথক জ্ঞানভিত্তিক রাগানুগা ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দরায়, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সিদ্ধ মুকুন্দদেব প্রমুখ গোস্বামীগণ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের আদি প্রবর্তক ছিলেন বলে বর্তমান সহজিয়া মোহন্তরা মনে করেন। বিশেষত কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ রচনায় এবং চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদগুলিতে সহজিয়া ধর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করেন সহজিয়া

বৈষ্ণবরা।[১৭] তাঁরা চৈতন্যমহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বছরের প্রেম-ভক্তিকে ধর্মাচরণের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা একমাত্র রাধাভাবকে অনুশীলন করেছেন কারণ রাগানুশীলনে শান্তরতির প্রশান্তভাব, দাস্যরতির সেবাভাব, সখ্য রতির সখা ভাব এবং বাৎসল্যরতির স্নেহ, বাৎসল্যভাব, সহজিয়া ভাবসাধনায় প্রস্ফুটিত হয়ে রাধাভাবে সকল ভাবের একত্রে সমাবেশ হয়েছে। অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাগানুগা পাঁচপ্রকার ভাবের যে কোনও একটি ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপর সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এবং সহজিয়া বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের যে স্বরূপ সাধনা করেছেন সেই স্বরূপের উল্লেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। এই পরিচ্ছেদের বর্ণনায় দেখা যায় রায় রামানন্দকে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের স্বরূপের কথা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের পরমতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান।।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।[১৮]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা মনে করেন যে কৃষ্ণই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা, রক্ষাকর্তা এবং সকল দেবতার আধার। বৈষ্ণবধর্ম উপাসনায় বৈধীভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি এই দুই ভক্তি গুরুত্ব পেয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বৈধীভক্তি থেকে রাগানুগা ভক্তিকে পৃথক করে বলেন, রাগানুগা ভক্তি স্বতঃফূর্ত অন্তরের প্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছে। তাই রাগানুগা ভক্তি বৈধী ভক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতে বৈধীভক্তি থেকে রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। কারণ তাদের বৈধীসাধনা রাগমূলক দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে বীজমন্ত্র গ্রহণের পর শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাওয়া উপদেশের দ্বারা বিধিপূর্ব ভাবসাধনা করতে গিয়ে নতুন ভাবসাধনার উদয় এবং সহজভাবে বিকাশ ঘটে। সেই সহজ ভাব রাগের অনুগ হয়ে ভাবের অনুবর্তনই রাগানুগা, ভক্তিসাধনা। সে ক্ষেত্রে বৈধী ভক্তির আচরণ নিরর্থক।[১৯]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ কারণ

চৈতন্যদেবের কলিযুগে আবির্ভাবের ভিত্তিভূমি মূলত দুটি কারণের উপর — ক) বহিরঙ্গ ও খ) অন্তরঙ্গ। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার উপর ভিত্তি করে *চৈতন্যভাগবত* রচনা করেছিলেন। পতিত মানুষের উদ্ধার এবং নামগান প্রচারের কার্যপ্রণালী চৈতন্যদেবের কলিযুগে আবির্ভাবের অন্যতম বহিরঙ্গ কারণ। *চৈতন্যভাগবত* রচনার প্রায় ষাট বছর পর কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে নীলাচল লীলার বর্ণনায় অন্তরঙ্গ কারণ বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার অন্তরঙ্গ সাথী স্বরূপ দামোদরই এই অন্তরঙ্গ কারণ অনুধাবন করেছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ অসুর সংহার করার জন্য আবির্ভূত হলেও তা তাঁর মুখ্য কারণ ছিল না। তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য কারণ ছিল প্রেমরস নির্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত জগতে রাগমার্গ ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্য, তেমনই কলিযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যুগধর্ম ও নামসংকীর্তনের প্রচার মুখ্য কাজ নয়। প্রেম আস্বাদন ও নামসংকীর্তন আস্বাদন লাভ তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। অন্তরের ভক্তির ভাবগ্রহণ করে চৈতন্যদেব নিজে নামসংকীর্তনের অনুষ্ঠান করেছেন এবং ভক্তিধর্মের প্রচার করেছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর — নানান ভাবের, নানান ভক্তের বৈষ্ণবধর্মের সমাবেশ ঘটেছে।

বৈষ্ণব ভাবগুলিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় কান্তা বা মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। এতে রসমাধুর্য অন্যান্য ভাবের থেকে অনেক বেশি। এই মধুর রসকে সাধারণতঃ দুই ভাবে ভাগ করা যায় —

ক) স্বকীয় — যা দ্বাপরে কৃষ্ণের দ্বারকালীলায় রুক্মিণী, সত্যভামার প্রতি প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা।

খ) পরকীয় প্রেম — যা দ্বাপরে কৃষ্ণের ব্রজধামে রাধিকা এবং গোপীনিদের প্রতি প্রমের স্বরূপ বর্ণনায় রয়েছে।

দ্বাপরে রাধা পরকীয়া প্রেমের চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন এবং মাধুর্য ভাব উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ বিচ্ছেদ, স্ব-সুখ বাসনাশূন্য রাধা সর্বোত্তম প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করেছিলেন, সেই ভাব অঙ্গীকার করে কলিযুগে কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে নিজের বাসনা পূর্ণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রেমধর্ম ও নামসংকীর্তন — এই দুই যুগধর্ম স্থাপনের জন্য তিনি আবির্ভূত হলেও এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের বিরহে রাধাভাব আস্বাদনের ইচ্ছা।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মাস্বরূপ, দ্বাপরে আলাদা আলাদা ভাবে আবির্ভূত হয়ে লীলা করেছেন। আর কলিতে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত রাধাভাবে ভাবিত হয়ে নীলাচল লীলায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতি রাধাপ্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করেছেন। যেমন দ্বাপরে ব্রজধামে রাধিকা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং রসাস্বাদনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। রাধা হলেন কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ এবং কৃষ্ণের আহ্লাদিনী নামক স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তি। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির তিনটি রূপ — সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ অংশে শক্তির নাম সন্ধিনী, চিৎ অংশে শক্তির নাম সম্বিত, আনন্দ অংশে শক্তির নাম আহ্লাদিনী। এদের মধ্যে আহ্লাদিনীর সারভূত অবস্থার নাম। এই প্রেমের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তির অবস্থার নাম ভাব। ভাবের চরম রূপ হল মহাভাব। এই মহাভাবই হল রাধার স্বরূপ। রাধিকাই হলেন মহাভাব স্বরূপিনী; কৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বগুণময়ী।[২০] রাধা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি আর কৃষ্ণ সেই শক্তির অধিপতি। অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান কৃষ্ণের রাধিকা হলেন পূর্ণশক্তি। যেমন সূর্যকিরণ থেকে সূর্যকে আলাদা করা যায় না, তেমনই রাধা ও কৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন। পূর্ণশক্তিমান কৃষ্ণ ও পূর্ণশক্তি রাধা ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে জগতের জীবকে প্রেমভক্তির শিখা দেওয়ার জন্য কলিযুগে কৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

চৈতন্য অবতারের মূল তত্ত্ব প্রচারক ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর। তিনি নীলাচল লীলায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তত্ত্বের উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন —

ক) রাধার প্রণয়মহিমা কী রকম,

খ) কৃষ্ণের নিজের মাধুর্য কী রকম,

গ) রাধা সেই মাধুর্য আস্বাদনে যে সুখ লাভ করেছিলেন সেই সুখই বা কেমন।

রাধা যেমন কৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিভোর থাকতেন, তেমনই মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত হয়ে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণের অন্বেষণ করেছেন। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে সখীভাবে গলায় জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণের কথা জানতে চেয়েছেন। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভুকে তাঁরা *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে শ্লোক পাঠ করে শুনিয়ে শান্ত করতেন। মহাপ্রভু কখনো বা সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার পথে চটক পর্বতকে গোবর্ধন পর্বত বলে মনে করেছেন –

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ।।
গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ।।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।। [২১]

আবার কখনও সমুদ্রতীরের পুষ্প উদ্যানকে বৃন্দাবন বলে মনে করে কৃষ্ণের অন্বেষণ করতেন। অন্ত্যলীলার চতুর্দশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধররেম্র সমন্বয়বাদী মনোভাব

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সুফিধর্মের প্রভাব পড়েছিল। ঐ সময় থেকে প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর অনুসন্ধান এবং সকল মানবজাতির মধ্যে প্রেমানুভব লাভ

করার প্রয়াস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সুফিধর্মের মূলকথা। চৈতন্যদেব যবন হরিদাসসহ বহু যবনকে যেমন আত্মার আত্মীয় বলে গণ্য করেছিলেন, তেমনই চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মোহন্তেরা চণ্ডালসহ পতিত মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের উপশাখা বাউলসহ বহু বৈষ্ণবশাখা সমগ্র মানবজাতির প্রতি সমন্বয়মুখী হয়েছিলেন। গুপ্ত রাজবংশের সময় থেকে সেন রাজবংশের সময়কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির সামাজিক পটভূমিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হয়েছিল এবং বিকাশ লাভ করেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ অবধূতের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বকাল থেকে নবদ্বীপে এবং শান্তিপুরে বৈষ্ণবদের একত্রিত করেছিলেন। তিনি ভক্তি থেকে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি ঠিকই, তবে তিনি ভক্তিহীন ব্রাহ্মণদের সহ্য করতে পারতেন না। অদ্বৈতাচার্য শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, আবার তিনি তরজার ভাষাও জানতেন। যার নিদর্শন কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর অন্ত্যলীলায় দিয়েছেন।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* উভয় গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় অদ্বৈত আচার্য মধুর রসের সমর্থক ছিলেন না। তিনি ভক্তির সঙ্গে ভাবপ্রবণতার সংমিশ্রণ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, রাগানুগা ভক্তির ভিত্তি হল ভাব, অদ্বৈত আচার্য দাস্য ও সখ্যভাবের উপর দিয়েছিলেন। এইভাবে বহিঃপ্রকাশ অদ্বৈতাচার্যের জীবনাচরনের এবং ধর্মাচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন নিত্যানন্দ অবধূত। দেশভ্রমণের সময় তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব ভক্তিরসে ভাবিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ পাওয়া যায় অদ্বৈত আচার্য এবং চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে নিত্যানন্দ অবধূত দণ্ড ও কমণ্ডুলু ভেঙে দিয়েছিলেন। নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য এবং চৈতন্যদেব যে

বৈষ্ণব ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, নিত্যানন্দ অবধূত সেই ভক্তিভাবকে প্রভাবিত করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ নিত্যানন্দের কৃষ্ণভক্তিভাব প্রকাশিত হলেও তিনি মধুর ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না। দাস্য ও সখ্য ভাব তাঁর ভক্তিভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি ধর্মপ্রচারের সময় যেমন জাতিভেদ প্রথা মানেন নি, তেমনই জ্ঞানমার্গের প্রতি তাঁর কোনও মোহ ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান — সকল জাতির মানুষ বৈষ্ণবধর্মে স্থান পেয়েছিলেন। তাই চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন কোনো স্তর থেকেই শ্রেণি সংগ্রাম ছিল না, তা মূলত সমন্বয় সাধনের আন্দোলন। এই আন্দোলনে যেমন শ্রেণিবিরোধ প্রকাশ পায় নি, তেমনই মুসলমান ধর্ম অথবা মুসলমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে কখনো শ্রেণিভিত্তিক ধর্মাচরণ হয় নি। সকল ধর্মের মানবজাতির প্রতি সমন্বয় সাধন করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই হয়েছিল।

উপসংহার

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ আলোচনা করে দেখা যায়, ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, সেই বৈষ্ণবধর্ম ছিল নামগান, জপ-তপ প্রধান। কৃষ্ণনাম প্রচারের মধ্য দিয়ে সহজেই চৈতন্যদেব জনসংযোগ ঘটিয়েছিলেন। কারণ তাঁর প্রচারিত শাস্ত্রের আড়ম্বরহীন বৈষ্ণবধর্ম সহজেই সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিল।

চৈতন্যদেবের গভীর কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তি সাধারণ মানুষকে যেমন অভিভূত করেছিল তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও অভিভূত করেছিল। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা থাকায় জীবদ্দশায় তাঁকে বৈষ্ণব ভক্তগণ দেবতারূপে অভিহিত করতে না পারলেও তিরোভাবের পর

দেবতার স্থান দিয়েছিলেন। তাই আজও বৈষ্ণবভক্তগণ কৃষ্ণনামের সঙ্গে গৌর-নিতাইয়ের নামগান করেন।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর যখন বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্যপ্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কমে আসছিল, তখন বৈষ্ণবধর্ম মূলত বাংলায় চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রভাব পড়েছিল। ফলে চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে বিভক্ত হয়েছিল।

চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে যে পঞ্চরসের ব্যখ্যা সূচিত হয়েছিল, এদের মধ্যে মধুর রস গুরুত্ব পেয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং সহজিয়া বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের কাছে। মধুরভাব অর্থাৎ কান্তা প্রেম এই দুই সম্প্রদায়ের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এবং সহজিয়া বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনির গুরুত্ব দিয়েছেন আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। রাধা-কৃষ্ণের পরকীয় প্রেমকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অলৌকিক দেবতার লীলা বলে অভিহিত করেছে। সহজিয়া বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমকে বাস্তবে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা জপ-তপ, নামগানের সঙ্গে শাস্ত্রী ব্যাখ্যার মাধ্যমে কৃষ্ণের সাধনা করেছেন। যেখানে দেহতত্ত্বের কোনও স্থান নেই। সহজিয়ারা নামগান, জপ-তপের সঙ্গে দেহতত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন কৃষ্ণের সাধনায়। এইভাবেই দুটি সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি আলাদা হয়ে গেছে। রুচি অনুসারে মানুষের ঈশ্বর আরাধনা যেমন স্বীকৃত হয়েছে, তেমনই সাধন পদ্ধতিতেও এসেছে বৈচিত্র্য।

তথ্যসূত্র :

১ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত*। আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ২৬।

২ চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিতদিত) (২০১৪)। গিরি, সত্যবতী। 'বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম', *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি। পৃ. ৩৪৫।

৩ চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (১৩৯৩)। *চৈতন্য পরিক্রমা*। কলকাতা : খিদিরপুর হরিসভা। পৃ. ৬০।

৪ তদেব, পৃ. ৬১।

৫ তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬।

৬ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)।*চৈতন্যচরিতামৃত*। অন্ত্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২৩৪।

৭ মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। *শ্রীচৈতন্যের উপাদান*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ৫৪০-৪১।

৮ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। মধ্যখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৬৯।

৯. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৮৪)। *যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*। কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৮৫-৮৬।

১০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ অধ্যায়। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ১৪৪।

১১. *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। মধ্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ৮০।

১২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ১৮২।

১৩ *চৈতন্যচরিতামৃত*। অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। তদেব : সাহিত্য অকাদেমী। পৃ. ১৭৯।

১৪ দাস, পরিতোষ (১৯৭৮)। *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম*। কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ২১-২৬।

১৫ তদেব। পৃ. ২১-২২।

১৬ তদেব। পৃ. ৭১-৭২।

১৭ তদেব। পৃ. ১৭৯-১৮০।

১৮ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)। *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ৭১।

১৯ দাস, পরিতোষ (১৯৭৮)। *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম*। তদেব। পৃ. ৩৪৯।

২০ ভট্টাচার্য, অমিত্রাসূদন (সম্পাদিত) (১৯৯৮)। *পরামৃত শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৩০।

২১ সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬)।*চৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। তদেব। পৃ. ২২২।

উপসংহার

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের দ্বারা গড়ে ওঠা ধর্মীয় আন্দোলন মধযুগে ব্যাপক মাত্রা লাভ করেছিল। কারণ মানুষ প্রথম ধর্মীয় গোঁড়ামীর বাতাবরণ ভেঙে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের আনন্দ উপলব্ধি করেছিল। ঐ সময়ই চৈতন্যদেব প্রথম বর্ণভেদের উপর আঘাত হেনেছিলেন। ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব সমাজব্যবস্থার উপর পড়েছিল। ফলে তৎকালীন সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। চৈতন্যদেব সক্রিয়ভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির কোনও পরিবর্তন না ঘটালেও জাতিভেদপ্রথার গণ্ডী ভেঙে সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে জনসংযোগ ঘটানোই বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন।

ধর্মীয় আন্দোলন অষ্টম শতাব্দী থেকে অতি সন্তর্পণে শুরু হলেও ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব ধর্মীয় আন্দোলনের পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর আগে বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার আড়ম্বর ছিল না ঠিকই, তবে তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম অশাস্ত্রীয় এই তথ্য তিনি কখনও প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে বৈষ্ণব উপাসকেরা নিজ নিজ আরাধ্য দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ, বিষ্ণু, রাম-কৃষ্ণের উপাসনা করতেন এবং তিই নিজেই রাম-কৃষ্ণের তত্ত্ব কথা শ্রবণ করতেন এমন ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যভাগবত* এবং *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সমাজ সংস্কারক চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে কেবল ধর্মসাধনার বৃদ্ধি ঘটাননি, সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছে। তিনি ধর্মান্তরকরণ রোধ করেছেন, পতিত, নির্যাতিত, নিম্নবিত্ত মানুষদের একত্রিত করে জনসংযোগ ঘটিয়েছিলেন। তিনি নিম্নবিত্ত মানুষদের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন করে প্রতিবাদ করার শক্তি জুগিয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব শৈশব থেকেই প্রতিবাদ করা শুরু করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের মাথা

ব্রাহ্মণদের বুঝিয়েছিলেন, জাতপাতের ভেদাভেদ বড় নয়, মানবধর্মই বড় ধর্ম। এছাড়া শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের ভয়ে নিম্নবিত্ত মানুষের ধর্মান্তরকরণের জোয়ারকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে।

ষোড়শ শতকে সমাজজীবনে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের প্রভাব অপরিসীম। বাংলা ও উড়িষ্যায় এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। দক্ষিণভারতে তথা কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবনে তুলনামূলকভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব কম পড়লেও তাত্ত্বিক বিকাশে সেখানেই ঘটেছিল। সমাজের প্রতিটি স্তরের সংস্কার সাধনে তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়নের পক্ষে ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত*-এ চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা বর্ণনায় চৈতন্যদেব বর্ণভেদ বিরোধী ছাত্র, আবার শিক্ষক হিসেবেও উদার। তাঁর এই সহজ, সরল, সাধারণ আচারণগুলির মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। আসলে চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণদের সামাজিক আধিপত্য খর্ব করে এমন এক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে বিরাজমান থাকবে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম শতক থেকেই চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরগণ সমাজের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সামাজিক সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে উৎসাহী ছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাব এবং ফল বাংলা ও উড়িষ্যায় স্পষ্টভাবে পড়েছিল।

চৈতন্যদেবের উদার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পরিকর ও অন্যান্য বৈষ্ণবরা কুসংস্কারমুক্ত এক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সমকালে এবং চৈতন্য-পরবর্তীকালেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসা

ও সমাজসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা চৈতন্যদবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবভক্তগণের জীবনের ব্রত ছিল। বৈষ্ণবধর্ম হয়ে উঠেছিল কীর্তন প্রধান। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই ধর্ম সকলেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধারা আজও অব্যাহত। *চৈতন্যচরিতামৃত* ও *চৈতন্যভাগবত* উভয় গ্রন্থ আলোচনা করে দেখা যায় চৈতন্যদেবের কাছে ধর্মীয় বিভেদ বড় ছিল না, তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে শাস্ত্রের আড়ম্বরতা ছিল না তাই বহু নির্যাতিত মানুষ ধর্মান্তরণের পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ করছিলেন। এই ভাবেই চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জনসংযোগের জোয়ার ঘটিয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের গভীর কৃষ্ণ প্রেমভক্তি চৈতন্য পরিকরদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষদেরও অভিভূত করেছিল। দৃঢ় ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছিলেন চৈতন্যদেব। তাই চৈতন্যদেবের গভীর কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি বৈষ্ণব ভক্তগণ উপলব্ধি করতে পারলেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে দেবতারূপে অভিহিত করতে পারেন নি। তাঁর তিরোভাবের পর বৈষ্ণব ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে দেবতার স্থান দিয়েছিলেন। ঐ সময় থেকে গৌর-নিতাইয়ের নামগান কৃষ্ণনামের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি ছিল প্রধান। বৈষবধর্মে চৈতন্য প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যখন থেকে কমে আসছিল ঐ সময় থেকে বৈষ্ণবধর্মে জ্ঞানের প্রভাব পড়েছিল ফলে চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম নামে অভিহিত হয়েছিল। এই দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যদেব প্রচারিত পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মধ্যে মধুর রস গুরুত্ব পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে মধুর ভাব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও এরা কান্তা প্রেমকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষ্ণের পরিকীয়া প্রেমকে অলৌকিক দেবতার লীলা বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর উপাসনায় দেহতত্ত্বের কোনও স্থান দেননি। জপ, তপ, নাম, গান ও শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম পালন করেছেন। অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে বাস্তবে

স্থান দিয়েছেন। সহজিয়া বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের সাধনায় দেহতত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা সাধনায় সঙ্গে নিয়েছেন একজন বৈষ্ণবী সাধনসঙ্গিনী। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে মূলত জপ, তপ, নামগানের সঙ্গে দেহতত্ত্বের প্রভাব পড়েছে। এই ভাবেই দুটি সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি আলাদা হয়ে গিয়েছে।

চৈতন্যদেব চারিত্রিক দৃঢ়তায় ষোড়শ শতকে সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও তাঁর দার্শনিক মনের পরিচয় চরিত গ্রন্থগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। চৈতন্যদেব সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হলেও তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহংকার কখনও ছিল না। শিক্ষার অহংকার ও ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলে শত্রুতার বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তবে বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে বন্ধু করাই মনস্তাত্ত্বিক মনের পরিচয়। চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণবভক্তগণকে সেই পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি অধর্মাচারী পাষণ্ডদের মুক্তি ঘটিয়ে সত্যের পথে ধর্মপালনের পথ দেখিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে ক্রমে বহু বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়-বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন এবং নির্লিপ্ত ভাবে বৈষ্ণবধর্ম পালনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ বৃন্দাবনে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন, রাধা-কৃষ্ণের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করছিলেন, যা আজও ইতিহাসসম্মতভাবে মূল্যবান হয়ে আছে মানবজাতির কাছে।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ দুটি আলাদা সময় অর্থাৎ ষাট বছরের ব্যবধানে এবং আলাদা পটভূমিতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নবদ্বীপ ও নীলাচলে দাঁড়িয়ে রচিত হলেও এই গ্রন্থগুলির মূল বিষয় হল চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী । এই গ্রন্থদুটিতে সমকালীন দেড়শো বছরের সামাজিক প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যা আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্বের মূল্যবান দলিল।

চৈতন্যভাগবত ও *চৈতন্যচরিতামৃত* আলাদা সময় এবং আলাদা পটভূমিতে রচিত হলেও বর্তমানেও বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থদুটিকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে আছে । বৃন্দাবনদাস এবং

কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন । তাদের রচিত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে চরিত সাহিত্য নামে নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টি করার পাশাপাশি বৈষ্ণব উপাসকদের কাছে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে স্থান পেয়েছে। বর্তমান সময় ও বৈষ্ণব উপাসকরা যেমন- নাম-গান, যব-তপের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব কথা এবং চৈতন্যদেবের মহিমা বর্ণনা করেন তেমনই নানান বৈষ্ণব আখড়ায় ও এই গ্রন্থগুলি পাঠ করা হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত ও *চৈতন্যভাগবত* — এই দুই মহাগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি বৈষ্ণবদর্শন ও রসপ্রস্থানের অভিমুখটিকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। আমার এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ব্যপ্ত, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় দিকের খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও আমার কাজের মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এই বিষয়টি গবেষণার জন্য আরও অভিনিবেশের প্রয়োজন। যদি পরবর্তীকালে আমি কাজ করার সুযোগ পাই তাহলে আমার কাজের দিকগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব এবং নতুন নতুন দিক দেখানোর চেষ্টা করবো।

গ্রন্থপঞ্জি

- গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (২০০৩)। *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
- গিরি, সত্যবতী (২০০৭)। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
- গিরি, সত্যবতী। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ*। (সম্পাদনা) মজুমদার, সমরেশ বসু। কলকাতা : রত্নাবলী।
- গুপ্ত, (সম্পাদিতদিত) (১৯৮৬)। *শ্রীচৈতন্য : একালের দৃষ্টিকোণ* । কলকাতা : যুগ প্রকাশনী।
- গুপ্ত, নির্মলনারায়ণ (১৯৮৬)। *ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য*। কলকাতা : যুগ প্রকাশনী।
- গোস্বামী, ননীগোপাল (১৯৮৬)। *চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব*। কলকাতা : রত্নাবলী।
- ঘোষ, পারুল (১৩৮৩)। *বাংলার বৈষ্ণবধর্ম : সাহিত্যে ও দর্শনে*। কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।
- ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদিত) (১৯৯৫)। *বৃন্দাবনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) (১৩৯৩)। *চৈতন্য-পরিক্রমা*। কলকাতা : খিদিরপুর হরিসভা।
- চৌধুরীম, মৈত্রেয়ী (২০০২)। *প্রসঙ্গ চৈতন্যদেব*। কলকাতা : সুরীতি চৌধুরী (ব্যক্তিগত উদ্যোগ)।
- চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর (২০০৪)। *শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ*। নদীয়া : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ।
- চক্রবর্তী, রমাকান্ত (১৯৯৬)। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।
- চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত) (২০১৪)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।
- জানা, নরেশচন্দ্র (১৯৯৬)। *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
- দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ (২০১১)। *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।
- দাশগুপ্ত, শশীভূষণ (১৩৯৬)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা : এ. মুখার্জী. এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।
- দাস, ক্ষুদিরাম (২০১৫)। *বৈষ্ণবরসপ্রকাশ*। কলকাতা : দে'জ সংস্করণ।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) (১৯৯৩)। *শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ভূমিকা*। কলকাতা : সাধনা প্রকাশনী।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (১৯৯৭)। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা : প্যাপিরাস।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস (১৯৯৭)। *চৈতন্য চর্চার পাঁচশো বছর*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০৭)। *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন।
- ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত) (১৯৯৮)। *পরামৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৪০০)। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (১৯৬২)। *প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
- ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৮৪)। *যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*। কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।
- মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬)। *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো।
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ; সেন, সুকুমার, চৌধুরী, বিশ্বপতি এবং চক্রবর্তী, শ্যামাপদ (সম্পাদিত) (২০০৯)। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (২০০০)। *বৈষ্ণবপদাবলী*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পাদিত) (২০০৩)। *কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতারমৃত*। কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটির।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময় (১৯৯৩)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী প্রকাশন।
- সরকার, আভা (২০০৩)। *মধ্যযুগে নবদ্বীপ*। কলকাতা : পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার (১৩১১)। *চৈতন্যভাগবত*, আদি খণ্ড। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি।
- সান্যাল অবন্তীকুমার ও ভট্টাচার্য অশোক (সম্পাদিত) (২০০২)। *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি।
- সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮)। *বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী।
- সেন সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৬৩)। *কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি।
- সেন সুকুমার (সম্পাদিত) (১৩৯২)। *চৈতন্যাবদান*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
- রায়, অনিরুদ্ধ এবং চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত) (২০১২)। *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা : কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি।
- রায়চৌধুরী, বাঁশরী (১৯৯৭)। *শ্রীচৈতন্যভাগবত*। কলকাতা : প্রয়াস প্রকাশন।